হিরণ্যগর্ভ
দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১লা বৈশাখ, ১৪২৬

Hiranyagarbha
Volume 12, No. 1
हिरण्यगर्भ
द्वादश वर्ष, प्रथम संख्या
तारिख-१५ अप्रैल, २०१९

১লা বৈশাখ, ১৪২৬ 15th April, 2019

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন - ব্যাসদেব	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
	পঞ্চকেদারের পথে পথে	শ্রীসৌরভ বসু	10
	জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	12
	শিপ্রা জন্মকথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	14
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	15
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	16
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	17
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	18
	মৃত্যুর অতীত	শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায়	19
	কোথায় তোমরা চলেছ?	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	20
	শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	21
	মহাবলশালী নৃপ দেবসেন	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	22
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	23
	সদ্‌গুরু প্রফুল্ল ঠাকুর প্রসঙ্গ	শ্রীঅরিন্দম মিত্র	24
हिन्दी विभाग ঃ—			
	भगवान कृष्णद्वैपायन - व्यासदेव	श्रीमती ज्योति पारेख	27
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	31
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	32
	शिप्रा जन्मकथा	श्रीमती ज्योति पारेख	33
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	34
	श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन	श्रीमती ज्योति पारेख	35
	महाबलशाली नृप देवसेन	श्रीमती ज्योति पारेख	36
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	37
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	38
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	39
	पंचकेदार के पथ पर	श्रीमती ज्योति पारेख	40
English Section ঃ—	Bhagwan Krishna-Dwaipayan Vyasa	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	43
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	48
	Gems From the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	49
	Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	50
	Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	51
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	53
	Mata Sharbani Trust Annual Report		55

ISBN No. 978-81-940673-0-6 Cover : Maharshi Veda Vyas

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

বসন্তের মাধুর্য্যমণ্ডিত, কোকিল-কূজিত-কুঞ্জবনে লেগেছে চৈত্রশেষের উতলা হাওয়ার দোলা — আসন্ন বৈশাখের তপ্ত নিঃশ্বাসে শাল-পলাশের রক্তিমতায় এসেছে ক্রমবিবর্ণতা। উদাসী হাওয়ায় বৃক্ষচ্যুত বিশুষ্ক পত্ররাজি স্মরণ করিয়ে দেয়, আশা-নিরাশার দোলায় আমরা পেরিয়ে এলাম আরও একটি বছর। নতুন বছরের নবীন আলোকে ধুয়ে মুছে যাক অতীতের সকল দীনতা, জীর্ণতা। অনাগত ভবিষ্যতের শুভ প্রত্যাশায় আমরা নতুনভাবে উজ্জীবিত হই আধ্যাত্মিক ভাবধারার আত্মনিবেদনের নব অঙ্গীকারের স্বপ্ন নিয়ে।

বাংলা নববর্ষের এই পুণ্য লগ্নে ভক্তিবিনম্রচিত্তে আমরা প্রণতঃ হই ভগবৎলীলা-সংঘটক, অবতারকল্প ঋষি ভগবান শ্রীব্যাসদেবের চরণকমলে। ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণসাযুজ্যসম্পন্ন যোগীশ্রেষ্ঠ ঋষি। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণলীলা ও মহাভারতের অতুল্য যোগদর্শন, ভগবান বেদব্যাসেরই সাধনার এক অনিন্দ্য দিব্যপ্রকাশ। কলিযুগে সনাতন ধর্মের সংরক্ষনার্থ বেদ-বিভাজন, অষ্টাদশ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ণ ও প্রেম-ভক্তিযোগের মাধুর্য্যমণ্ডিত 'ভাগবত সংহিতা' — তাঁরই অমল কীর্তি।

হিরণ্যগর্ভের এই নববার্ষিক সংখ্যাটি পরম মঙ্গলময়, পরম করুণাময় এই মহাত্মার চরণে নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম। তিনি শুধু বৈদিক ঋষি নন — তিনি সদা মঙ্গলময়। তাঁর অনুকম্পা আমাদের মনোজগতে জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকায় সদা প্রদীপ্ত। ঋক্‌মন্ত্রে এই ভগবতকল্প মহাত্মাকে আমরা অন্তরের প্রণাম জানাই।

"ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্ত্রে পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্।।
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় শ্রীবিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ।।"

— হরি ওম্ তৎ সৎ —

Spells of warm air are sweeping the blossoming bowers of spring even as the reddish tinge of sal and palasha trees are turning a murky brown. The imperceptible falling leaves of trees leave us a gentle reminder that another year has receded into the past. On this day, let us leave behind all our failures and pettiness of the past and rejuvenate ourselves with new hope and resolves that beckon us in the year that lies ahead.

On the auspicious occasion of Bengali New Year, we offer our humble obeisance to the lotus feet of Bhagwan Shri Vedavyas, the avatar incarnate of Lord Vishnu. He was the manifestation of Lord Krishna himself and chronicled the advent of the Lord through His divine creation, the Mahabharata. In order to protect the existence of Sanatan dharma from the trauma of the Kali Yuga, he sub-divided the Vedas in a compendium of four volumes, compiled the Puranas in eighteen volumes and created the holy "Bhagwat Samhita", the immortal scripture that dwells on the ultimate spiritual tenets of love and devotion to the Lord.

We feel ourselves blessed to offer this edition of Hiranyagarbha as homage to His lotus feet. He was not just another Vedic saint –- He was and He still is omnipresent in our spiritual realm and blesses and enlightens us with His sublime compassion always. We feel blessed to invoke His blessings through a Sanskrit hymn sung in His praise:

"Vyasam Vasishthanaptaram Shoktre Poutramkalmasham,
Parasharatmojam Bande Shukotatam Taponidhim
Vyasaya Vishnurupaya Vyasrupaya Shri Vishnove,
Namo Vai Brahmonidhoye Vasishthaya Namo Namah"

ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন - ব্যাসদেব

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতীর তনয় শক্তি। মহর্ষি শক্তি ও অদৃশ্যন্তীর পুত্র মহর্ষি পরাশরের ঔরসে দাসবংশের ধীবর-রাজকন্যা মৎসগন্ধার (সত্যবতী) গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যমুনা দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'দ্বৈপায়ন' এবং যুগে ধর্মের পাদক্ষয় এবং মনুষ্যদিগের আয়ু ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া, বেদের স্থায়ীত্ব ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি আকুলতাপ্রযুক্ত পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর এক নাম হয় বেদব্যাস বা ব্যাসদেব। তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ভগবান শঙ্কর, ঋষি পরাশরের সাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যোগশ্রেষ্ঠ, জরা-মৃত্যুরহিত 'বেদব্যাস' নামে পুত্র প্রদান করেন। এই বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নই হইলেন পুরাণ প্রসিদ্ধ এক অনন্য ভগবৎলীলা সংগঠক ঋষি। দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণলীলা ও মহাভারতের লীলা ভগবান বেদব্যাসেরই সাধনার এক অচিন্ত্য দিব্যপ্রকাশ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মমাত্রই শৈশবাবস্থা হইতে বর্দ্ধিত হইয়া মাতা সত্যবতীকে বলিলেন, ''আমি এখন তপস্যার্থ গমন করিব। আপনার যখনই কোনও বিশেষ কারণে প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিবেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ আপনার নিকট উপস্থিত হইব।'' মাতাকে এই সুদৃঢ় আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি প্রত্যেক তীর্থে স্নান করিয়া পরম তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল অতিবাহিত করিলে পরে একসময় কলিযুগ সমাগত অনুভব করিয়া তিনি বেদরূপ বৃক্ষকে শাখাদি দ্বারা শোভিত করেন। শাখাদি দ্বারা বেদের বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'বেদব্যাস' নামে অভিহিত হন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ সংহিতা ও মহাভারত মহাকাব্য প্রণয়ন এবং বেদবিভাগ করিয়া তৎশিষ্য সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত ও দেবল এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ব্রহ্মসূত্রম্' বা 'বেদান্ত দর্শনম্' প্রণয়ন করেন।

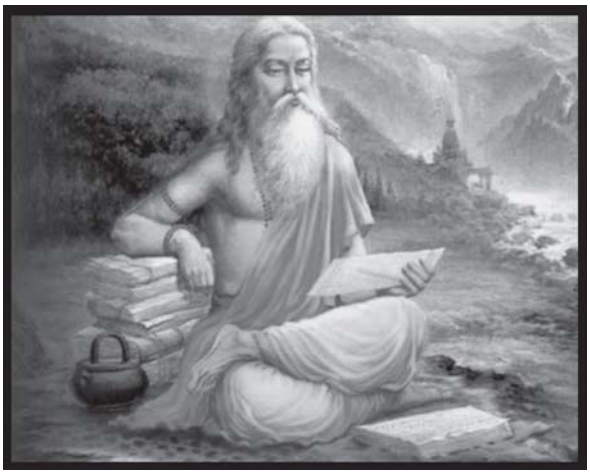

ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন - ব্যাসদেব

অগ্নিপুরাণে আছে, দ্বাপর যুগান্তে ভগবান 'শ্রীহরি' বেদব্যাসরূপে অবতরণ করিয়া বেদবিভাগ করিয়া থাকেন। আদিতে বেদ চতুষ্পাদ ও শতসহস্র শাখা সমন্বিত একমাত্র যজুর্বেদ ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাহাকেই চারিভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে যজুঃ সমূহে 'আধ্বর্য্যব'; ঋক্ সমূহে 'হোত্র'; অথর্ব সমূহে 'ব্রহ্মত্ব' বিধান করিয়াছেন। বেদব্যাসের শিষ্য পৈল ঋগ্বেদে পারদর্শী ছিলেন। ব্যাসদেবের অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ তরুর সপ্তবিংশতি শাখা কল্পনা করেন। জৈমিনী সামবেদ তরুশাখা কল্পনা করেন এবং সুমন্ত অথর্ব তরু বিভাগ করিয়া পৈপ্পলাদি সহস্র সহস্র শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। আর সূত ব্যাসের প্রসাদে 'পুরাণ সংহিতা' প্রণয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহর্ষির এই সকল সুবৃহৎ কর্মাবলী সনাতন ধর্ম সংরক্ষণার্থ পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎসত্তা ভিন্ন এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়; যিনি ভগবৎসত্তা তিনিই অবতারকল্প, ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ বলিয়া কথিত হন। মৎসপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ মতে পরাশরনন্দন বেদব্যাসকে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে এবং বিষ্ণুর নবম বুদ্ধাবতারে দ্বৈপায়ন পুরোধা ছিলেন।

পরাশরনন্দন বেদব্যাস সনৎকুমারের নিকট উপনীত হইয়া, ''ঘোর কলিযুগে শ্রেয়স্কর কি এবং কিরূপ কর্ম করিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়''— তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ভগবান সনৎকুমার তাঁহাকে বলেন যে বারাণসীতে যাইয়া শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে বোধগম্য হয় যে ব্যাসদেব সনৎকুমারের নিকট 'মোক্ষযোগ' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম যোগমার্গে বারাণসীর অধিষ্ঠান আজ্ঞাচক্রে এবং যোগী সেই অবস্থায় উপনীত হইলে পরে স্ফটিকস্বচ্ছ শ্বেতশুভ্র নীলবর্ণাভা সমন্বিত যে

জ্যোতির্লিঙ্গটি দর্শন করেন, উহাই বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর। আজ্ঞাচক্রের বারাণসীতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা শক্তি সম্মিলিত শিবলিঙ্গ দর্শনে যোগী মোক্ষমার্গ প্রাপ্ত হইয়া সহস্রার অভিমুখে যাত্রা করেন। পার্থিব বারাণসীর মাহাত্ম্যও যোগীগণের পক্ষে মোক্ষস্বরূপ কারণ ভূলোক সপ্তলোকের অন্তর্গত স্থূল প্রকৃতির জগৎ যেখানে জীবের ক্রমবিবর্তন সাধিত হয়।

কোনও সময় বেদব্যাস কাশীতে ভিক্ষোপজীবি ও শিবারাধনা তৎপর হইয়া বাস করিতেছিলেন। তখন একদিন ভগবান শিব ব্যাসকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পার্বতীকে বলিলেন, ''আজ যাহাতে ব্যাস কাশীতে কোথাও ভিক্ষা না পান, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিও।'' শিবের কথানুসারে দেবী পার্বতী তখন কাশীর প্রত্যেক গৃহস্থের ভবনে যাইয়া ব্যাসকে ভিক্ষাদান করিতে বারণ করিয়া আসিলেন। দেবীর ঐ নিষেধের ফলে ব্যাসদেব সশিষ্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া একমুষ্ঠিও ভিক্ষা পাইলেন না। তার পরদিবসেও ভিক্ষা না পাওয়াতে ব্যাসের সন্দেহ হইল যে কেহ হয়তো তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে গৃহস্থদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ভিক্ষা না পাওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাহারা সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়াও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরন্তু পর্য্যটন করিয়া কাহারও গৃহে ধনধান্যের বিন্দুমাত্র অপ্রাচুর্য্য দেখিল না। ইহাতে ব্যাসদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে, ''কাশীবাসীগণ যেহেতু ভিক্ষা দিতে বিমুখ, সেই পাপে কাশীতে লব্ধ বিদ্যাধন ও মুক্তি তিন পুরুষ পর্যন্ত লব্ধ হইবে না।'' এইরূপে অভিশম্পাত করিয়া ব্যাস ক্ষুধার জ্বালায় পীড়িত হইয়া পুনরায় ভিক্ষার্থ বাহির হইলেন এবারেও সারাদিন ভ্রমণ করিয়াও কিছুই পাইলেন না। অবশেষে সায়ংকালে ক্রোধে ভিক্ষাভাণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুন্ন মনে নিজ আবাসে যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে দেবী ভগবতী একজন সামান্য গৃহস্থ-নারীরূপ ধারণপূর্বক এক ভবনের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্যাসদেবকে তাঁহার গৃহের অতিথি হইবার জন্যে অনুরোধ করিলেন। দেবী বলিলেন যে তাঁহার স্বামী প্রত্যহ অন্ততঃ একজন অতিথিকে ভোজন না করাইয়া অন্নগ্রহণ করেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইদিনই তাঁহাদের কোনও অতিথির সাক্ষাৎলাভ হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার স্বামীরও সমস্ত দিবস আহার হয় নাই। তাই দেবী ব্যাসকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে ব্যাস যদি তাঁহাদের গৃহে অতিথি হন, তবে তাঁহার স্বামী ও তিনি অতিথি সৎকার করিয়া ধন্য হইবেন। ব্যাস তখন দেবীকে বলিলেন যে দেবী যদি তাঁহার দশসহস্র শিষ্যেরও আহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবেই তিনি তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন, অন্যথা নহে। দেবী ইহাতে সম্মত হইলে পরে তখন সশিষ্য ব্যাসদেবকে তাঁহাদের ভবনে অন্নগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্যাস তাড়াতাড়ি সমুদয় শিষ্যগণকে লইয়া আহারের জন্যে সেই গৃহে সমবেত হইলেন। অতঃপর দেবীও তাঁহাদিগকে পরম পরিতোষপূর্বক আহার করাইলেন। আহারান্তে সশিষ্য ব্যাস যখন প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন তখন দেবী তাঁহাকে বলিলেন —''আপনি অনুগ্রহপূর্বক তীর্থবাসীদিগের ধর্ম কীর্তন করুন। আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া এইখানে অবস্থান করিব।'' তখন ব্যাস দেবীকে প্রথমে পাতিব্রত্য ধর্ম কীর্তন করিলেন। দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে সাধারণ ধর্ম কীর্তন করিতে বলিলেন। তখন ব্যাস বলিলেন যে কর্কশ বাক্যে লোকের মনোকষ্ট উৎপাদন না করা, পরের উন্নতিতে অসূয়া প্রকাশ না করা, বিবেচনার সহিত কার্য্য করা এবং নিজ ভবনের মঙ্গল চিন্তা করা, ইহাই সাধারণ ধর্ম। তখন দেবী ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন —''এই সকল ধর্মের কোন কোনটি আপনার মধ্যে আছে?'' — ব্যাস তাহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তখন শিব পরিহাসচ্ছলে বলিলেন —''আমার মনে হয় এই গুণ তোমাতেই আছে এবং তুমিই পরম ধার্মিক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কাহারও মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে, সেই ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশম্পাত প্রদান করে, তবে তার জন্যে কে পাপভাগী হয়?'' ব্যাস তার উত্তর দিলেন যে ''সেই পাপ বিবেচনাহীন শাপদাতারই হয়।'' তখন শিব স্বমূর্তিধারণ করিয়া বলিলেন —''তুমি নিজের দুরদৃষ্টবশতঃ ভিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া নিরপরাধ কাশীবাসীদিগকে অভিশাপ দিয়াছ। তজ্জন্য তুমি এস্থানে বাস করিতে পারিবে না।''

শিবকর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ব্যাসদেব নিজ মূর্খতা অনুভব করিলেন এবং শিব-পার্বতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা বিধান দিলেন যে প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মাত্র তিনি কাশীধামে প্রবেশ করিতে পারিবেন। পরবর্তীকালে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়া ব্যাসদেব শিবের অসীম অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। তখন তিনি স্বেচ্ছানুযায়ী বারাণসী-কাশীতে আসা-যাওয়া করিতেন। এই ভগবৎলীলায় ভগবান সকলকে সজাগ করিয়া দিলেন যে ঈশ্বরকোটীর সত্ত্বা হইলেও মায়া-মল কখন যে কাহাকে

আবরিত করিয়া ভ্রমে পতিত করে তাহা কেহ বলিতে পারে না। ব্যাসদেব ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিতে হইয়াছিল এবং তপোরত থাকাকালীন তাঁহাকে কখনো কখনো আমরা নিত্য সিদ্ধাসন হইতে চ্যুত হইতে দেখিতে পাই; যেমন, ব্যাসকাশী সৃষ্টির ঘটনাবলী। ভগবৎসত্তার সমগ্রজীবনই সৎশিক্ষায় পূর্ণ থাকে। তাই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট আমরা সৎশিক্ষাই গ্রহণ করিব। যাঁহারা লোকশিক্ষা দিতে অবতরণ করেন, তাঁহারাই হইলেন সদ্‌গুরু এবং ব্যাসদেব ভগবৎলীলা সংঘটক অনন্য ঋষি তাই জগদ্‌গুরু বিশ্বগুরু বলিয়া আজও পূজিত হন। তাঁহার জন্মদিন ঁশ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিতে।

মহামুনি ব্যাসদেব দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষি জাবালির কন্যা বটিকার পাণিগ্রহণ করেন। বটিকার গর্ভে শুকদেবের জন্ম হয়। পুত্র শুকদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাসদেব কর্মপ্রভাবে লোকের কোন গতিলাভ হয় এবং জ্ঞানবলেই বা কি প্রকার গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। ইহা ভিন্ন ব্যাসদেব শুকদেবকে বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। সেই সমস্ত মহাভারতের শান্তিপর্ব, অনুশাসন পর্ব, স্বর্গারোহণ পর্বে আছে। বেদব্যাস মথুরা বাসকালে কৃষ্ণগঙ্গাতীর্থে স্নান ও তপস্যা করিতেন। গোমতী-গঙ্গা তীরস্থ নৈমিষারণ্যে ব্যাসদেব আপন আসন স্থাপন করিয়া বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। সরস্বতী নদীতীরে ব্যাসাশ্রমে দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব হইলে ব্যাসদেবের অনুরোধে নারদ তাঁহাকে নিজ পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলিয়া ভক্তিযোগ ও প্রেমযোগের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার বিশাল মহাভারত মহাকাব্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যখন কোনও লেখক খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তিনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাঁহার দুঃখের কথা ব্যক্ত করিলে ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে গণেশকে স্মরণ করতে বলিলেন। ব্রহ্মার নির্দেশে ব্যাস গণপতি গণেশকে স্মরণ করিতেই গণেশ ব্যাসের তপোবনে আবির্ভূত হইলেন। তখন ব্যাস বিঘ্নহর্তা গণেশকে তাঁহার রচিত মহাভারত মহাকাব্য লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। গণেশ সম্মত হইলেন। বলিলেন, ''বেশ, তাহাই হইবে। আমি তোমার কাব্য লিপিবদ্ধ করিবার দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু একটি শর্ত আছে। আমি যখন লিখিতে থাকিব তখন আমার লেখনী যেন কোনভাবেই স্তব্ধ না হয়।'' ব্যাস দেখিলেন — মহাসমস্যা! এত বিশাল রচনা কি চিন্তা-ভাবনা না করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলা সম্ভব? এদিকে লিপিকার অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং গণেশ। তিনি ঝড়ের গতিতে লিপিবদ্ধ করেন। তাই ব্যাস ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন —''বেশ, মানিলাম আপনার শর্ত। কিন্তু আমারও একটি শর্ত আছে। আমি যাহা বলিব তাহা আপনি না বুঝিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না।'' গণেশ সম্মত হইলেন। মহাভারত লেখা আরম্ভ হইল। ব্যাস মাঝে মাঝেই গণেশকে অত্যন্ত কঠিন, গূঢ় অর্থবহ একটি করিয়া শ্লোক বলেন, যাহা লিখিবার পূর্বে গণেশকেও বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য খানিকক্ষণ লিখন থামাইতে হয়। সেই অবসরে ব্যাস মনে মনে আরও অনেকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া লন। এইভাবেই মহাভারত রচনা যথাসময়ে সুসম্পন্ন হইল।

সর্বভূতের হিতার্থে বেদব্যাস করুণা-পরবশ হইয়া মহাভারত রচনা করিলেন। (মহাভারতের অন্তর্নিহিত অর্থ যোগতত্ত্ব সার)। পরন্তু বিভিন্ন প্রকারে সর্বভূতের মঙ্গলার্থে চেষ্টা করিয়াও তখন মহান বাদরায়ণ (বেদব্যাস হিমালয়ের বদরিবৃক্ষ পরিবৃত সরস্বতী নদীতীরে নির্জন গিরিগুহায় বহুকাল তপস্যারত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অন্য নাম 'বাদরায়ণ'।) অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি অপ্রসন্ন চিত্তে সরস্বতী তীরে নির্জনে বসিয়া আপন মনে অনেক বিতর্ক করিয়া অবশেষে ভাবিলেন যে তিনি অনেক কঠোর তপ অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন, গুরুদের ও অগ্নিদের আরাধনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত রচনা করিয়াও তাঁহার অন্তরে তৃপ্তিবোধ হইতেছে না তিনি বোধ করিলেন — কই, এতশত করিবার পরেও তাঁহার অন্তরাত্মা তো ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত হইতেছে না! নিজেকে আত্মস্থও বোধ করিতেছেন না। তবে কি পরমহংসদিগের প্রিয় অচ্যুতদেবেরও প্রিয় ভাগবতধর্মের কথা অপর্য্যাপ্ত বলা হয় নাই? সেই কারণে কোথায় যেন হৃদয় মধ্যে এক শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। এইভাবে নিজেকে অপূর্ণ মনে করিয়া যখন তিনি দুঃখ পাইতেছিলেন, তখন কুরুক্ষেত্রের নিকট স্থানে সরস্বতী নদীর তীরে বদরিবৃক্ষ পরিবেষ্টিত ব্যাসাশ্রমে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মানন্দন নারদকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিবার পর নারদ ব্যাসদেবকে বলিলেন, ''পরাশর নন্দন, আপনার দেহ-মন সব ভাল তো? আপনি যে বৃহৎ অত্যদ্ভুত মহাভারত রচনা করিয়াছেন তাকে সর্বার্থসার বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। তাছাড়া আপনি সনাতন ব্রহ্মকে বিচার করিয়া তাঁকে লাভও করিয়াছেন। তথাপিও আপনি নিজেকে অপূর্ণ মনে করিয়া শোক করিতেছেন কেন?'' তখন ব্যাস বলিলেন,

—''আপনি যাহা যাহা বলিলেন সেই সমস্ত আমার আছে ঠিকই, কিন্তু তবুও আমার আত্মা তৃপ্তি পাইতেছে না। ইহার কারণ কি?'' ব্যাসের কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন, ''আপনি আপনার রচিত গ্রন্থাদিতে শ্রীভগবানের অমল যশের কথা প্রায় বলেন নাই। শুধু ধর্মের জ্ঞানে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হন না, আর যে জ্ঞানে তিনি তুষ্ট হন না, আমার মনে হয় সেই জ্ঞান ব্যর্থ। মুনি শ্রেষ্ঠ, আপনি যেভাবে ধর্ম বা অনুষ্ঠানাদির কথা কীর্তন করিয়াছেন সেইভাবে বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করেন নাই। রাজহংস যেমন শুধু মানস সরোবরেই বিহার করে, পরমহংসগণও তেমনি হরিপাদপদ্মেই পরমানন্দে লগ্ন থাকেন। যে গ্রন্থে অনন্তকীর্তি ভগবানের যশকথা কীর্তিত হয়, তাহা অপভাষায় রচিত হইলেও তাহার বাক্য সজ্জনেরা শোনেন, গান করেন এবং অন্তরে ধারণ করেন। সেই গ্রন্থই মানুষের পাপনাশে সমর্থ। অতএব আপনি ভগবৎলীলা প্রচার করুন। ভগবানের কীর্তির কথা শুনিলে মুমুক্ষুর জ্ঞানপিপাসাও তৃপ্ত হয়। ভগবানের নাম শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। তাঁহার চরণসেবাই তীর্থসেবা। সেই ভগবানের নাম যখন আমার এই বীণার তারে ঝংকৃত হয়, তাঁহার বীর্যবান কীর্তিকথা যখন গানের সুরে মন্দ্রিত হইয়া ওঠে, তখনই যেন আকুতিপূর্ণ প্রাণের ডাকে তিনি আমার চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠেন। বিষয়ভোগ বাসনার আক্রমণে অবসন্নচিত্ত সংসারীদের পক্ষে হরিভজনই সংসাররূপ সাগর পার হইবার একমাত্র তরণী। অতএব হরিসেবাই একমাত্র শান্তির পথ।'' এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া দেবর্ষি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বদরিবৃক্ষ সমাকীর্ণ ঋষিদের 'সম্যাপ্রাস' নামক আশ্রমে ব্যাসদেব আচমন সারিয়া একাগ্রমন হইয়া ধ্যানে বসিলেন। শুদ্ধাভক্তিযোগ হেতু তাঁহার মন নির্মলতা প্রাপ্ত হইলে তখন তিনি আদি পুরুষ ভগবানকে এবং তাঁহার অধীন মায়াকে দর্শন করিলেন। ভক্তিযোগের পথ অনুসরণ করিলে, ভগবদ্দর্শন হইলে, সংসারের যাবতীয় অনর্থ অচিরে দূর হইয়া যায় কারণ ভগবান হইতেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উৎপত্তি। সংসারী বিষয়ী লোক মূঢ়, তাহাদের এই কথা জানা নাই। তাই সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যাসদেব তখন 'ভাগবত সংহিতা' রচনা করিলেন।

স্বানুভূতির আলোয় :— মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণ সাযুজ্যপ্রাপ্ত একজন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যক্তিত্ব। এই ঋষিকল্প মহামানব কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা আমরা জানিতে পারি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ রচিত 'কলিতে ঐশ্বরিক লীলা' এবং শ্রীঅমরেন্দ্র শ্যাম রচিত 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থে, ভগবান কিশোরীমোহন বা কিশোরীবাবা রূপে। আমার তপোপূর্ণ জীবনে ভগবান কিশোরীমোহন আমায় নিজ আত্ম-পরিচয় 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' ঋষি রূপে প্রদান করিয়া কলিতে ঐশ্বরিক লীলা মাধুর্য্যের তত্ত্বগত বিশিষ্টতা কি, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এঁনারই অনুকম্পায় আমার তপোলব্ধ জীবন ভক্তিযোগের নিগুঢ় অবস্থায় উপনীত হইতে সহায়ক হয়। ভগবান কিশোরীমোহন বলিতেন —''আমার এ দেহ পূর্ণের আধার।'' শ্রীভগবানের ভক্তশিষ্যগণের সঙ্গে লীলাও ছিল শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুরূপ। সেই অবতারকল্প মহান মহর্ষির প্রতি ভক্তিবিনম্র প্রণাম জানাই।

ভগবান কিশোরী মোহন

— হরি ওঁ - কৃষ্ণ ওঁ —

সমর্পণ

বিগলিত বিশুদ্ধ অহং সত্তা, শুদ্ধা ভক্তিরস সিক্তা
ভাব স্বভাবে চাহে অর্পণ, সৎচিৎ আনন্দময়েরে করি সমর্পণ।
যোগযুক্তা মুক্তাবস্থা হেন, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পরিপূরণ
বিকল্পহীন চিত মন নির্বিকল্প অবস্থায় করি অবস্থান।।

—সমর্পণ অর্থে আত্মসমর্পণ। পূর্ণ সমর্পিত প্রাণে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার হইয়া মিশিয়া থাকা।

—শ্রীশ্রীমা রচিত 'সৃজা' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৯। (পত্র নং ১০) —(দ্বিতীয় ভাগ) সাধারণ যোগীগণ অর্থাৎ কৃপাযুক্ত যোগীগণ ১০৮-এ স্থিতিলাভ করেন। ইহাই অনন্ত। ইহাকে ভেদ করিতে না পারিলে অনন্তের অন্ত হইয়া ১০৯-এ প্রবেশ অর্থাৎ একের মধ্যে অনন্তকে সমাবিষ্ট করা সম্ভবপর হয় না। —(এই বিষয়ে শ্রীমার মন্তব্য)

গুরু এখন পার্থিব দেহে নাই বলিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া বীজ প্রাপ্ত হইয়া যে কোন ব্যক্তি 'নিমিত্ত' রূপ আধার হইতে পারেন। তাঁহার দেহ গুরুদেহ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। এই প্রকার প্রতিনিধি 'নিমিত্ত' মাত্র। ইহার পারিভাষিক নাম 'আধা'। এই আধাতেই গুরুর অনন্ত শক্তি নিহিত হয়। মরদেহ সম্পন্ন 'আধা'কে এই প্রকার গুরুভার বহনের উপযোগী করিবার জন্যে অতি কঠোর তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। (বর্তমানকালে ঐ 'আধা' সম্পন্ন মহাত্মা কে এবং কোথায় আছেন?)

উত্তর — (পত্র ১০-এর দ্বিতীয় ভাগ) — সর্বপ্রথমে জানা যাক, কৃপাযুক্ত যোগমার্গ বিষয়টি কি? কৃপাযুক্ত যোগে যখন যোগী দীক্ষালাভ করেন তখন সদ্‌গুরু সর্বপ্রথমে তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ ৪৯টি অণু সকলকে (অর্থাৎ, ৪৯টি অণু বা ৪৯টি বায়ুর কেন্দ্র যা ললনা চক্র বলিয়া কথিত, আমাদের তালু কুহরের মধ্যে ও কেন্দ্রে যার অবস্থান) আকর্ষণ করেন এবং আকর্ষণ করতঃ নিজ চিন্ময় কায়াকে মিলাইয়া নেন, যার ফলে যোগীদেহের পরমাণুগুলি অণুহীন হইয়া ক্ষণমাত্রের জন্য বর্তমান থাকে — এ অবস্থায় পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে আর তাহার আশ্রয়রূপী মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ স্থূলদেহটি (ধরাটি), যেটিকে 'physical coat' বলা যায়, সেটি থাকে। এই স্থূল বস্ত্ররূপী দেহটি তখন জড়বৎ বা শববৎ অবস্থান করে। তাহার পর সদ্‌গুরু তাহার নিজকায়া হইতে তদংশভূত শুদ্ধকায়া ঐ পরমাণুতে সংযোজিত করেন। ইহা হইলে পরবর্তী যোগীর কায়া চিন্ময় হইয়া শুদ্ধদেহে পরিণত হয়। এই শুদ্ধদেহ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় স্বরূপ, যাহা সদ্‌গুরু-দীক্ষা দ্বারা শিষ্য প্রাপ্ত হয়। সদ্‌গুরু দীক্ষা শুদ্ধতেজোময় আকার স্বরূপ। দীক্ষাকালে শিষ্য নির্বিকারভাবে ইহা দর্শন করিতেও সক্ষম হন — কূটস্থের গগন-মণ্ডলে যেন কোটি-সূর্য্যের স্নিগ্ধ তেজোদীপ্তি সোনার জ্যোতির আবির্ভাব — ইহারই নাম জাগ্রত কুণ্ডলিনী। ইনি চৈতন্য স্বরূপ, ইহাকেই 'গুরুশক্তি' বলা হয়। যোগমার্গে দীক্ষিত শিষ্যের মধ্যে এই গুরুশক্তিই কর্ম করিয়া থাকে। ইহাই শিষ্যের প্রতি সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ বা কৃপা। সাধনা করিতে করিতে একদা শিষ্য-আধারে এই গুরুশক্তিই পুষ্টিলাভ করিয়া পূর্ণত্বদান করেন। প্রকৃতপক্ষে ইনিই সাধকযোগীর ইষ্ট এবং চরমাবস্থায় ইনিই স্বয়ং মহামায়া দুর্গাশক্তি, মহাশক্তি, যিনি সত্তার দুর্গতি নাশ করেন — হৃদয়পদ্মের কর্ণিকায় এই মহাশক্তির বিকাশ হয়। ইহাই ১০৭। এ অবস্থায় যোগীর বোধ মহাজ্ঞান ভেদকরতঃ এই মহামায়ারূপা চিৎপ্রকৃতির স্বারূপ্যলাভ করেন। তৎপরে ১০৮-এ প্রকৃতিকে ছাপিয়ে (বা পার হইয়া) অনন্তবোধের পুরুষোত্তম অবস্থায় যোগীর বোধ উপনীত হয়। ইহার পর যখন যোগীর হৃদয়গ্রন্থি সম্পূর্ণভাবে ভেদন হইয়া যায় তখন অদ্বৈত স্থিতিতে উপনীত হইয়াও যোগী অনন্তকে নিজ অস্তিত্ববোধের মধ্যে ধারণ করিতে সক্ষম হন। ইহাই যোগীর ১০৯-এ প্রবেশ অর্থাৎ একের মধ্যে অনন্তকে সমাবিষ্ট করা। এই জন্যেই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন —"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।"

গুরু স্থূলদেহে বর্তমান না থাকা অবস্থায় কেহ কেহ গুরুর সূক্ষ্ম বা কারণ জ্যোতির্ময় চিন্ময় দেহ হইতে দীক্ষিত হইয়া বীজপ্রাপ্ত হন এবং তখন সেই ব্যক্তি 'নিমিত্ত' রূপে গুরুরূপী গুরুশক্তির আধার হইতে পারেন। ঐ 'নিমিত্ত' দেহ সদ্‌গুরুর প্রতিনিধি মাত্র। ইহারই পারিভাষিক নাম 'আধা'। এই আধাতেই গুরুর অনন্তশক্তি নিহিত হয়। স্থূলদেহ সম্পন্ন 'আধা'কে গুরুভার বহনের উপযুক্ত করিবার জন্যে অতি কঠোর তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। বস্তুতঃ গুরুই 'আধা' দেহকে পূর্ণত্বর পানে অগ্রসর করাইয়া দেন। তাঁহার দেহ গুরুদেহ হইতে ভিন্ন নহে। সকল মহাত্মাগণই

যাঁহারা তাঁহাদের সদ্‌গুরুর দ্বারা গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই 'আধা'। সদ্‌গুরু পরম্পরার অনন্তশক্তি তাঁহাদের সত্তায় সন্নিবেশিত থাকে কারণ উঁহারা সদ্‌গুরু-সমর্পিত সত্তা। সদ্‌গুরুই সদ্‌গুরুকে নির্বাচন করেন এবং জগতকল্যাণ কর্মে সদ্‌গুরুগণ নির্বাচিত আধারূপী সদ্‌গুরুর সত্তার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে (অঙ্গাঙ্গীভাবে) সংযুক্ত রহেন।

বর্তমান কালে ঐ 'আধা' সম্পন্ন বহুর মধ্যে একজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। তিনি হইলেন শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর। এঁনাকে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মজ্যোতি কায়া ধারিণী আদিশক্তি মহামায়া স্বরূপিণী প্রথমে শক্তিসঞ্চারকরতঃ সাধন নির্দেশ প্রদান করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা পালন করান। তৎপরে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষি মহাকারণ জ্যোতির্ময় দিব্যদেহে আবির্ভূত হইয়া শক্তিসঞ্চার করেন। শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুরের কোন স্থূলগুরু ছিল না।

সদ্‌গুরুর স্থূলদেহ নাই অথচ কেহ কোন দিব্যপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা বীজ প্রাপ্ত হইল, এমন আধাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সুউচ্চ কোটির ঋষিকল্প হন। পূর্বজন্মার্জিত প্রবল সংস্কারের ফলে এই প্রকার দীক্ষা লাভ হয় — বর্তমান যুগে কিছুদিন পূর্বেও ছিলেন শ্রীশ্রীরাঙামা ও শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা। ইহা ছাড়া বাঙ্গালোরের যোগীঋষি 'অমরা'ও আছেন।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ভ্রমণ

পঞ্চকেদারের পথে পথে

(১)

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, নন্দাকিনী, পিণ্ডার আরও অসংখ্য উপনদী, শাখানদী, প্রস্রবণের উৎসভূমি এই হিমালয়। পাইন, দেওদার, ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন, জুনিপারে পুষ্পিত হিমালয়। হেমকমল, ফেনকমল, ব্রহ্মকমলের দেশ হিমালয়, সর্বংসহা আনন্দময় হিমালয়, তার আকাশে বাতাসে আনন্দধারা। তীব্র আকর্ষণ তার প্রতিটি উপলখণ্ডে। হিমালয়ের যে কোন প্রান্তে যিনি একবার পা রেখেছেন, হিমালয়ের করুণাধারায় যিনি একবার স্নাত হয়েছেন তাঁর জীবনে হিমালয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। হিমালয়ের প্রভাবেই আসে হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ। আর সেই আকর্ষণেই মানুষ হিমালয়ের পথে পাড়ি দেয় বারবার, আর গাড়োয়াল হিমালয়ের হাতছানি - সেতো এক অমোঘ আকর্ষণ। মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অবধি গাড়োয়াল হিমালয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তার প্রতিটি আঁকাবাঁকা পথ, প্রতিটি চড়াই উৎরাই হিমালয়প্রেমী মানুষের তীর্থভূমি, পুণ্যভূমি, অভিযাত্রীর স্বপ্নালোক।

ব্রহ্মকুণ্ড, হরিদ্বার

গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, পঞ্চকেদার, সপ্তবদ্রী - হিমালয়ের এক-একটি দেবগৃহ। গৌরীকুণ্ড, ঋষিকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, রূপকুণ্ড, হেমকুণ্ড, নাগকুণ্ড, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, গোমুখ, তপোবন দেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদানের এক একটি অর্ঘ্যমাত্র। কেদারতাল বাসুকিতাল, ভোভিতাল হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

সময়টা ২০১০ সালের মহালয়ার পুণ্যপ্রভাত। মাতৃআরাধনায়, মাতৃবন্দনায় মুখর বাংলা। উপাসনা এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু। গন্তব্য হরিদ্বার। মাথায় শুধু পঞ্চকেদারের রূপ রেখা। কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ আর কল্পেশ্বর, হিমালয়ের পাঁচ দুর্গম শৈবতীর্থ ক্ষেত্র। মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চতীর্থ, পঞ্চকেদার।

পরের দিন সন্ধ্যায় যথাসময়ে উপাসনা এক্সপ্রেস এসে পৌঁছায় হরিদ্বারে। সেই পূর্বপরিচিত হরিদ্বার। দেবতার আগল ডিঙিয়ে শিবভূমির প্রথম সোপান। দীর্ঘ পরিক্রামার শেষে সুরধুনী গঙ্গার স্পর্শ পায় সমতলভূমি। যোগী মহাত্মার তপোভূমি ও চারধামের প্রবেশদ্বার, তীর্থযাত্রী, ভ্রমণার্থীর চরণ স্পর্শে পুণ্য প্রতিটি উপলখণ্ড। হরিদ্বার চিরনতুন, চিরচঞ্চল, আকাশে বাতাসে দেবতার স্তুতিগান। সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডের আরতি, পাতার নৌকায় প্রদীপ জ্বেলে প্রিয়জনের স্মৃতিচারণ। সুভাষঘাটে আলোর মালা, জলে মাছের খেলা। গঙ্গার দুই তীরে অসংখ্য দেব দেউলে কাঁসর-ঘন্টা-শঙ্খধ্বনি।

একরাত হরিদ্বারে কাটিয়ে সকালে পাড়ি দিই ঋষিকেশের পথে। সেখান থেকে বাস ধরে সোজা গৌরীকুণ্ড, আজ অবশ্য সেই গৌরীকুণ্ড নেই। ২০১২ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গৌরীকুণ্ডে একরাতের বিশ্রাম পরদিন সকালে শুরু হল পথচলা। পথ দূরত্ব চোদ্দ কিলোমিটার, গন্তব্য কেদারনাথ। সাত কিলোমিটার পথ চলার শেষে এসে দাঁড়াই রামওয়াড়াতে। এখান থেকে আরও সাত কিলোমিটার চড়াই পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছতে হবে কেদার ভূখণ্ডে — কেদার নাথের দরজায়। রামওয়াড়ার পর থেকেই বদলাতে শুরু করে প্রাকৃতিক শোভা। যত উপরে উঠি যতবার বাঁক ঘুরি ততবারই এক এক করে উন্মোচিত হয় কেদার শৃঙ্গের এক এক রূপ। ধীরে ধীরে এসে পৌঁছই গরুড় চটিতে। এখান থেকেই প্রথম দেখা যায় কেদারনাথের মন্দির। ধীরে ধীরে পথ চলি, পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াই কেদারনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে। উচ্চতা ১১৭৬০ ফুট। যোগীরাজ শঙ্করের লীলাভূমি। কেদারখণ্ডে প্রকৃতি বুক উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে হৃদয়ের সবটুকু ঐশ্বর্য। যুগ যুগ ধরে হিমালয়কে সাজিয়েছে নানা উপাদানে ও বিচিত্র ছন্দে। তার রূপ রস সৌন্দর্য্য আকণ্ঠ পান করেও আশ মেটে না। কেদারভূমির আকাশ-বাতাস প্রশান্তিময়। এভূমি ঋষির তপোক্ষেত্র, তীর্থযাত্রীর দেবভূমি, ভ্রমণার্থীর স্বপ্নলোক। কেদারভূমির পরশে নেশা লাগে। অন্তরে অনুভূত হয় অধ্যাত্ম চেতনার স্পন্দন। কেদারখণ্ডের আকর্ষণে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কেদার ভূমির সান্নিধ্যে কিংবা কেদারখণ্ডে রাত কাটালে এই অনুভূতি জাগবেই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন নিধনের পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবেরা উত্তরাখণ্ডে আসেন। কৈলাসপতির কৃপা লাভের আশায় তাঁরা গাড়োয়ালের নানা ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেন। দর্শন দিতে অনিচ্ছুক মহাদেব মহিষরূপ ধারণ করে মহিষের দলে মিশে যান। ক্রীড়াচ্ছলে ভীম হাত পা প্রসারিত করে পথ অবরোধ করেন। প্রকৃত মহিষ দল ভীমের প্রসারিত হাত পায়ের ফাঁক দিয়ে সহজেই চলে যায়। মহাদেবের কৌলিন্যে আঘাত লাগে। তিনি পশ্চাৎধাবন করেন। সুচতুর ভীমের অনুমান ভুল হয় না। তিনিও অনুসরণ করেন। বিরক্ত শিব আত্মগোপনে উদ্যত হন। সেই সময় ভীম মহিষরূপী শিবের পশ্চাতার্ধ জাপটে ধরেন। মহাদেব প্রস্তরে পরিণত হন। পাণ্ডবগণ ঐস্থানে মন্দির নির্মাণ করে মহাদেবের পুজো ও প্রার্থনা শুরু করেন। সেই থেকে ঐ স্থান কেদারভূমি নামে পরিচিত। সেই অনাদিকাল থেকে মহিষের পৃষ্ঠভাগের ন্যায় শিলা দেবতাজ্ঞানে আজও পূজিত হয়ে আসছে। মন্দিরের চারপাশে পাথর দিয়ে বাঁধানো উঠোন। প্রধান দরজার সামনে শিবের বাহন শিলা নির্মিত বৃষমূর্তি ও ত্রিশূল। প্রবেশ দ্বারের ডানদিকে সিদ্ধিদাতা গণেশ। ভিতরে মা ভগবতী, বামে মা লক্ষ্মী, মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব। সামান্য এগিয়ে গর্ভমন্দিরে শিলামূর্তিতে কেদারনাথ। মন্দির চত্বরে কয়েকটি কুণ্ড আছে — অমৃতকুণ্ড, রেচককুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড। মন্দির চত্বর থেকে আট কিলোমিটার দূরে বাসুকীতাল। মন্দাকিনীর পুলের বাঁদিক দিয়ে রাস্তা গিয়েছে বাসুকীতালে। সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে বাসুকীগঙ্গার। শোন-প্রয়াগে বাসুকীগঙ্গা এসে মিশেছে মন্দাকিনীতে। একরাত কেদারখণ্ডে কাটিয়ে ফিরে আসি গৌরীকুণ্ডে। ফেরার পথে নামে বৃষ্টি। একাকী পথ চলি। কেউ কোথাও নেই। অন্যান্য যাত্রীরা এদিক ওদিক আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে। মায়ের নাম নিয়ে এগিয়ে চলি। হঠাৎ এক বৃদ্ধার সাথে দেখা এই তুষার ঝড়ে সঙ্গী ছাড়া একাকী বৃদ্ধা নেমে চলেছেন গৌরীকুণ্ডের দিকে। দৈহিক সামর্থ মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হতে হয়। সীমাহীন বিশ্বাস তাঁর কথায় ও আচরণে। কোনো রকম অস্থিরতাই চোখে পড়ে না, সাথে টর্চ নেই, বর্ষাতি নেই, পায়ে হাওয়াই চটি, শীতবস্ত্রের মধ্যে দেহে সামান্য একটা চাদর, হাতে লাঠি। বয়সের কথা স্বীকার করলেও মনে তাঁর তরুণ সাহস। বুড়িমাকে আলো দেখাই। আমার টর্চের আলোয় তাঁর চলার গতি বেড়ে যায়। খুশির হাসি প্রকাশ পায় তাঁর কথায়, ''আমাকে আলো দেখানোর জন্যই কেদারনাথ তোমাকে পাঠিয়েছেন''। অবাক হয়ে যাই তাঁর কথায়। বুড়িমা হিমালয়ের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এখনো বেড়ান। হিমালয়ের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। প্রতি বছর তিনি কেদারে আসেন, দেবস্থলে পাদুকা বর্জনীয় তাই খালি পায়েই তিনি হিমালয় ভ্রমণ করেন। কোনো এক সন্তানের ইচ্ছার কারণে হাওয়াই চটি পরেছেন। দেখতে দেখতে এসে পৌঁছই গৌরীকুণ্ডে। প্রবেশের মুখে এক আস্তাবল। বুড়িমা আস্তাবলের একটি ঘরে প্রবেশ করেন। আমি বিদায় জানিয়ে কুণ্ডের ধারে চলে আসি। পরদিন সকালে গৌরীকুণ্ড ছেড়ে আসার আগে আস্তাবলে যাই বুড়িমার সন্ধানে, কিন্তু ঐ রকম কোনো মহিলার সন্ধান আস্তাবল কর্তৃপক্ষ দিতে পারে না। হতবাক হয়ে যাই। উনি কি সত্যিই বুড়িমা! নাকি বুড়িমার ছদ্মবেশে অন্য কেউ? তবে কি এও গুরুমায়ের লীলা! *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(৯)

গুরুদীক্ষা — (*পূর্ব প্রকাশিতের পর.....*)

মহাপুরুষদের অনন্য সাধারণ দীক্ষা পদ্ধতি এবং তাঁহাদের দীক্ষার কিছু দৈবচিহ্ন যে তাঁহাদের শিষ্যদের নিকট রাখিয়া যান তাহা বলাই বাহুল্য। মাণিকলালের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করিয়া

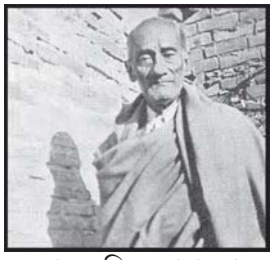

দীক্ষা দানের পর মুহূর্তেই তাহা আকস্মিকভাবে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া স্ফীত হয়, যাহা তিনি ভূতনাথবাবুর আলয়ে গিয়া অনুভব করিলেন ও তাহা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি প্রায়ই তাহা আমাদের হাত দিয়া অনুভব করাইতেন। ঐ স্ফীত স্থানে মাণিকলাল মাঝে মাঝে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতেন ও তাহার আশু উপশমের জন্য সময় সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নন্দকে সেখানে ঘুষি মারিবার নির্দেশ দিতেন তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার পরমপূজ্য গুরুদেবকে তিনি বাবাজী মহারাজ বা কৈলাসপতি বলিতেন। তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলে মাণিকলাল কখনো কখনো বলিতেন যে তাঁহার উপলব্ধিতে যতটুকু প্রতীতি জন্মাইয়াছে তাহাতে 'বাবাজী মহারাজ, চার যুগের অমরত্বের অধিকারী ত্রিকালজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ী পরশুরাম স্বয়ং।' তবে তাঁহাকে কখনো নাম জিজ্ঞাসা করিবার ধৃষ্টতা মাণিকলালের মানসপটে উদিত হয় নাই — ইহাও বলিতেন।

গুরুদীক্ষার বিষয়ে মাণিকলালের নিজ হস্তে লিখিত পুঁথি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি —''আমি আপন ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার মস্তকে যেস্থানে শ্রীগুরুদেব তাঁহার দেব হস্তটি দিয়া স্পর্শ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। ধর্মের তত্ত্ব যে ধর্মধামেই আছে, ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। বহিঃমুখ হইতে সদাই অন্তঃমুখে ফিরিতে লাগিলাম। স্থান কাল পাত্র অবিচারে প্রচার কিম্বা কামিনী কাঞ্চন, যশমানের অভিলাষ আর তেমন মনকে প্রলুব্ধ করে না। প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক যাহাতে মনকে হরণ না করে, শ্রীগুরুর চরণে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া সর্বদাই সজাগ রহিতে চেষ্টা করিলাম। একে একে আর্ত প্রেরিতগণ অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া আমার সহিত সংযুক্ত হইতে লাগিল। বিশ্বের আধারে মায়ের কোলে কোথায় কে ছিল, কেমনে আসিল, সবই বিস্ময়কর ঘটনা। চল্লিশ বৎসর পর মানব কল্যাণকর অপূর্ব কার্য্য পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হইবে বলিয়া ঠাকুর (শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী) যে দৈববাণী করিয়াছিলেন সেই কার্য সাধন কল্পে বোধ হয় শ্রীগুরুদেবের আমার প্রতি কৃপা দান। কৃতী শিষ্যের করুণ আবেদনে যিনি 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন, সেই গুরুদেবই এই বিশ্বময়ী কর্মের কারণ ও কারক হইলেন।

জীবনের এই স্মরণীয় ১৯১১ সাল হইতে একাধিক্রমে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল গুরুদেবের কৃপায় মাণিকলাল প্রাচ্যের আর্য্য ঋষিদের দর্শনের মূলতত্ত্বের সহিত পশ্চিমের প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন এবং গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আর্ত মহামনীষীগণ অত্যাশ্চর্য্যভাবে কিরূপে মাণিকলালের সহিত মিলিত ও যুক্ত হইয়া ছিলেন তাহার কিছু কিছু বিবরণ পরের অধ্যায় সমূহে ক্রমান্বয়ে পরিবেশন করিব।

ইস্টার্ণ রেলের অধীনে কানুর (অধুনা খানা জংশন) সেই শ্যামল প্রান্তর ও তাহার নিকটে বটবৃক্ষ আজও বর্তমান আছে। বিশেষ কীর্তিবহ সেই বটবৃক্ষটির নীচে বর্তমান রেলওয়ে তেলের গুদাম বিদ্যমান। মাণিকলালের জীবদ্দশায় ঐ পীঠস্থান আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।

দীক্ষালাভের পরও বাবাজী মহারাজের সহিত মাণিকলালের আরও কয়েকবার সাক্ষাৎকারের সংবাদ আমরা অবগত আছি। এই ঘটনা ঘটে তাঁহার চুঁচুড়া কামার-পাড়াস্থিত বাসভবনের দ্বিতলের সাধন-ভজন কক্ষে। এক সময় মাণিকলাল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা মহিমাকে কেন্দ্র করিয়া মহাপ্রভুর গুরু কেশব ভারতীর সহিত নিমাইয়ের গোপন যৌগিকভাবের আদান প্রদানের প্রকৃত রূপ আপন উপলব্ধিতে প্রাপ্ত হইয়া, যখন আপন গুরুর নিকট অন্তরে সমর্থন প্রার্থনা করিতে ছিলেন তখন, কৈলাসপতি বাবাজী মহারাজ, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া মাণিকলালের দেবকক্ষে উপনীত হন। বিস্ময়ে পুলকে, সম্মোহিত মাণিকলাল দুই মহাপুরুষকে উপবেশনের জন্য

দুইটি আসন প্রদান করিলেন।

মহাপুরুষদ্বয় আসন গ্রহণ করিয়া অতীব স্নেহান্তঃকরণে মাণিকলালের মনে উদিত সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যে আসন দুইটিতে তাঁহারা উপবেশন করিয়াছিলেন সেগুলি আজও মাণিকলালের ভবনে বিদ্যমান যাহা তিনি আনন্দাতিশয্যে প্রায়ই আমাদের দেখাইতেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ঐ একই রাত্রিতে চুঁচুড়ায় ধরমপুরে গোরস্থান সন্নিকটবর্তী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলা নিবাসী শ্রীসত্যেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বাসভবনে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদেরও দর্শনদান করেন। দৈবানুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের উপাসনা কক্ষে যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন ইহাই উপলব্ধি করিলেন যে ঐ একই রাত্রে কামারপাড়া ও ষণ্ডেশ্বর তলায় করুণাবতার প্রেমধর্মী মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। মাননীয় বঙ্কিমবাবু ও সত্যেনবাবু পরে মহাপ্রভুকে দর্শন-লাভের অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের ইতিবৃত্ত পুলকিত অন্তরে মাণিকলালের নিকট নিবেদন করিলেন। মাণিকলালও ঐ রাত্রিতে তাঁহাদের বিষয়ে মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী যাহা তিনি পূর্ব হইতেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদের শুনাইলেন ও তাঁহারা সকলে অনির্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। শ্রীসরকার মহাশয় আজও জীবিত ও আমাদের সহিত তাঁহার সংযোগ এখনো বিদ্যমান। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের শিষ্য,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

ভাগবৎ-কথা

শিপ্রা জন্মকথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

একদা মহেশ্বর ব্রহ্মার কপাল লইয়া সর্বলোকে বিচরণ করিতে থাকেন। সর্বলোকের কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া অবশেষে বৈকুণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন তিনি। তথায় ভগবান বিষ্ণুর নিকট ভিক্ষা চাহিলে তখন বিষ্ণু তাঁহাকে পরিহাসচ্ছলে, ''এই আমি তোমাকে ভিক্ষা দিতেছি'' বলিয়া তাঁহার কপালে তর্জনী স্পর্শ করিলেন। ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর বিষ্ণুর সেই অঙ্গুলি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন অঙ্গুলি হইতে রক্তধারা নির্গত হইয়া মহাদেবের হস্তের সেই ব্রহ্মাকপাল পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং পরে সেই পাত্রোচ্ছলিত রক্তধারা ভূতলে প্রবাহিত হইয়া 'শিপ্রা' নামে এক মহানদীর সৃষ্টি হইল।

ইহার পর কোনও সময়ে ক্ষুধার্ত মহাদেব কপাল হস্তে ভিক্ষার্থে পাতাল লোকে ভোগবতী নদীর তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না। তখন ক্ষুধার্ত হইয়া মহেশ্বর নাগলোকে রক্ষিত একবিংশটি কুণ্ডস্থিত সমুদয় অমৃত পান করিয়া ফেলিলেন। নাগগণ তাহা জানিতে পারিয়া ত্বরান্বিত হইয়া তখন নাগরাজ বাসুকীকে সংবাদ প্রেরণ করিল। বাসুকী তখন বিষ্ণুলোকে গমনকরতঃ ভগবান বিষ্ণুর নিকট সব কিছু ঘটনা নিবেদন করিলে, এক আকাশবাণী হইল —''হে নাগগণ, তোমরা ক্ষুধার্ত দেবতাকে আহার প্রদান কর নাই, তাই তিনি অমৃতকুণ্ডস্থিত সমুদয় অমৃত পান করিয়া ফেলিয়াছেন। তোমরা যদি তোমাদের অমৃত পুনর্বার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মহাকালবনে যাইয়া শিপ্রা নদীতে স্নান পূর্বক মহেশ্বরের আরাধনা কর। তাহা হইলে দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের সুধাভাণ্ড সকল পূর্ণ করিয়া দিবেন।'' তখন নাগগণ ঐ দৈববাণী অনুযায়ী কার্য্য করিলে তাহাদের সুধাসমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে সমুদ্রমন্থনে উত্থিত কালকূটের তেজে যখন দেবতা ও অসুরগণ অতিষ্ট হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় মহাদেব ঐ সমস্ত কালকূট কণ্ঠে ধারণ করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবী শিবানী ভীত হইয়া শঙ্করের সন্নিধান পরিত্যাগ করিলেন। ভূতনাথ ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন, ''তুমি এই ভয়ঙ্কর বিষকে তরঙ্গ সঙ্গে সাগরে লইয়া যাও।'' গঙ্গা ইহাতে অসম্মত হওয়ায় তখন মহাদেব শিপ্রা নদীকে অনুরোধ করিলেন। শিপ্রা মহাদেবের অনুরোধে তখন ঐ বিষকে বহন করিয়া মহাকালবনে লইয়া গেলেন। শিপ্রা নদী ব্রহ্মার পরমা কলা। শিপ্রা নদী অগ্নিদেবের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। বামন পুরাণে আছে, স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে শিপ্রা নদী তাঁহার সাহায্যার্থে তাঁহার অনুচর চিত্ররথকে প্রদান করেন।

(সহায়ক গ্রন্থ : স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ)

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৯)

শিষ্যের প্রতি তত্ত্বোপদেশ — (*পূর্ব প্রকাশিতের পর....*)

শ্রুতিতে জীবদেহকে 'ব্রহ্মপুর' বলিয়াছেন। যথা- 'যদিদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম-দহরো অন্তরাকাশ' ইত্যাদি।

জীবদেহ ব্রহ্মের বাসস্থান বলিয়া তাহাকে 'ব্রহ্মপুর' বলা হইয়াছে। হৃদয়পদ্মে বুদ্ধির সহিত ব্রহ্ম ক্ষুদ্রস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাহাকে দহরাকাশ, প্রত্যক চৈতন্য, সাক্ষী চৈতন্য, কূটস্থ চৈতন্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ইত্যাদি বলে। এখানে দহর, প্রত্যক শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। তিনি ক্ষুদ্র নহেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাঁহাকে 'দহর প্রত্যক' বলা হয়।

বেদান্ত-দর্শনে শ্রুতির দহরাকাশ যে ব্রহ্ম, জীব নহে ইহা 'দহর উত্তরেভ্য' এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

এইস্থানে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, সৃষ্ট আকাশ নহে। ঐ চৈতন্যের ন্যায় আভাস বা প্রতিবিম্ব বুদ্ধির সহিত মিলিত আছে। উহাকে আভাস চৈতন্য, চিৎপ্রতিবিম্ব, চিদাভাস ইত্যাদি বলে। ঐ চিৎপ্রতিবিম্ব বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া অচেতন জড় বুদ্ধিকে যেন সচেতনা ক্রিয়াশালিনী করে। তদ্দ্বারা অচেতনা বুদ্ধি রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া তত্ত্বদাকারে আকারিতা হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা বস্তুজ্ঞান হয় না। বুদ্ধি কখনই দ্রষ্টা নহে। উপরিউক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধির বৃত্তিকে দর্শন করেন, তখনই বস্তুজ্ঞান হয় (বুদ্ধি আভাস চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়াও দ্রষ্টা জ্ঞাতা হইতে পারে না। তদ্দ্বারা কেবলমাত্র বৃত্তিশালিনী হয়।) ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সদাই বুদ্ধিবৃত্তিকে দর্শন করেন তখন জ্ঞানোৎপত্তি হয়। উক্ত চিৎপ্রতিবিম্ব বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়াই ব্যবহারিক জীব বলিয়া উক্ত হয়; আর ক্ষেত্রজ্ঞা পুরুষই পারমার্থিক জীব। চিৎ প্রতিবিম্ব নামমাত্র জীব, প্রধান জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সদাই বুদ্ধিবৃত্তির দ্রষ্টা। তিনি বৃত্তিশূন্যা বুদ্ধিকে দর্শন করেন না। যখন সাধন দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তিশূন্য হয়, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই সময় জীবের আত্মদর্শন হয়; আর যখন বৃত্তি থাকে তখন বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া যেন তদকারত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির পরিণাম, পরিবর্তন, রূপান্তরতা আছে, আর চৈতন্যরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের তাহা কিছুই নাই। তিনি সদাই একরূপে আছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিকে দর্শন না করিলে জীবের কোন বিষয়ক জ্ঞানই থাকিত না।

জ্ঞান না থাকিলে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সমস্ত জড়বৎ থাকিত। এই হেতু তিনি পারমার্থিক জীব। সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্ম জীবাকার ধারণ করিয়াছেন। জীব অজ্ঞানপ্রযুক্ত অবগত নহে যে ব্রহ্মই তাহার আত্মা। ব্রহ্মচৈতন্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত — জড় ও জীবদেহ মধ্যে অবস্থিত। জীবদেহের নখ, কেশ পর্যন্ত ব্যাপিয়া ব্রহ্মচৈতন্য আছেন। চৈতন্যরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মচৈতন্য হইতে বিভিন্ন নহে। এই ব্রহ্মচৈতন্য প্রত্যেক দেহমধ্যে যেন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইয়া আছেন। তিনি বুদ্ধি বৃত্তির দ্রষ্টা বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বলে। ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে এক অদ্বিতীয় সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যই প্রত্যেক জীবদেহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষরূপে আছেন। অখণ্ড চৈতন্য যেন বিভক্তরূপে প্রতীয়মান কিন্তু তিনি অবিভক্ত, 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।' এখানে 'মাং' শব্দের অর্থ — আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে। ঐ সমস্ত অধ্যায়টি পাঠ কর বুঝিতে পারিবে। স্থূলদেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত আভাস চৈতন্য এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই সমস্ত লইয়াই জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগের হেতু। এজন্য তাহাকে ভোক্তা বলে। কিন্তু কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে ভোগ হয় না এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বিহীন মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ও স্থূলদেহ সম্পন্ন আভাস চৈতন্যেরও ভোগ হয় না। আভাস-চৈতন্য ও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই উভয়াত্মক ভোগ। জীব, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি ও স্থূলদেহের সহিত থাকিয়া অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ আপন পারমার্থিক স্বরূপ চৈতন্যকে অবগত নহেন। জীবের স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন। শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিবার কালে বলেন - 'সোহহং' — সেই ব্রহ্ম আমি। 'তত্ত্বমসি' — তৎ-ত্বম্-অসি। সেই ব্রহ্ম তুমি। তৎ শব্দের অর্থ — পরিব্যাপ্ত সমষ্টি ব্রহ্ম চৈতন্য ও ত্বম্ শব্দের অর্থ — দেহগত ব্যষ্টি চৈতন্য। এই উভয়ই যে একই চৈতন্য তাহাই উক্ত হইল। সাধন দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে, 'আমিই ব্রহ্ম', এতৎ সমস্তই

ব্রহ্ম এইরূপে তিনি ব্রহ্মকে অবগত হয়েন। ব্রহ্মকে অবগত হওয়াই জীবের জ্ঞান। অবগত না হওয়াই অজ্ঞান বা বন্ধন। জ্ঞানোদয় হইলে আর পুনর্জন্ম হয়না, কোন লোকেও গতি হয় না। উত্তর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন —"নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি, তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে।" ইহার অর্থ — যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া না জানেন, তাহার মুক্তি নাই। এইরূপ উক্তি প্রায় প্রত্যেক শ্রুতিতে এবং সর্বশাস্ত্রেই আছে। ব্রহ্মজ্ঞান অতি স্বাভাবিক। বুদ্ধি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্বিকা, তাহা রজো ও তমোমল যুক্ত হইয়া মলিন হইয়াছে। সাধন দ্বারা বুদ্ধি হইতে রজোস্তমোমল অপগত হইলে আপনিই ব্রহ্মভাবের বিকাশ হয়। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে বুদ্ধি হইতে তিনি স্বতন্ত্র।

...ক্রমশঃ

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৬১)

আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুমহারাজের (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) আশ্রম গৃহে অনেক উচ্চধরনের যোগী, সাধক, লেখক সকলের আনাগোনা লেগেই থাকত। এইরকম একজন সাধক লেখক শ্রীনিগূঢ়ানন্দ মাঝে মাঝে গুরু সঙ্গ করতেন। উনি তাঁর শিষ্যদের কাছে আমাদের গুরুমহারাজ (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছিলেন, সেটা ওনার লেখা 'জীবাত্মা রহস্য' এবং 'পরলোক ও জাতিস্মর' এই দুটি গ্রন্থ থেকে ওনার কথাতেই তুলে ধরলাম—

"মানুষের জীবিতকালে তার দেহের দ্বিতীয় সূক্ষ্ম সত্তা অন্যত্র বিচরণ করতে পারে। যোগীরা ধ্যানকালে তাঁদের দ্বিতীয় সত্তাকে দেখতে পান। তাঁরা প্রথম দেখেন নিজেকে পেছন থেকে। আস্তে আস্তে প্রতিবিম্বটি যোগীর দিকে ঘুরতে থাকে। শেষে মুখোমুখি হয়। এ হল যোগীরই দ্বিতীয় সত্তা দর্শন। কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের ফলেই এমন হয়।

কুলকুণ্ডলিনী জাগরণে দেহের শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি হেতু যোগীরা পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারেই এসব দেখেন। তবে যোগীরা দাবী করেন, ধ্যানকালে দেহের শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি হেতু তাঁরা সূক্ষ্ম দেহে বিভিন্ন গ্রহ গ্রহান্তরেও যেতে পারেন। সেটাও শক্তিমাত্রার তরঙ্গ ক্ষুদ্রতর হবার জন্যই দূরদর্শন হয় বলে মনে হয়, যেমন এখন ইলেকট্রিক মিডিয়া এই পৃথিবীতে থেকেই ভিন্ন গ্রহ থেকে প্রেরিত চিত্র ধরতে পারে। তবে যোগীদের দাবী, তাঁদের সূক্ষ্মদেহও সেই সব গ্রহের জীবেরা দেখতে পায়, কারণ, তা দেখে তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তবে আমি এমন এক যোগীকে দেখেছি যিনি সূক্ষ্মদেহে দেখা দিতে পারতেন। আমার প্রকাশক বন্ধু শ্রীদুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে তিনি সূক্ষ্মদেহে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি হলেন হাওড়া বাক্সাড়ার লাহিড়ী বাবা - শ্রীসরোজকুমার লাহিড়ী। দুলালবাবু বলেছিলেন তিনি অলৌকিক শক্তির কথা বলেন। তাঁকে চিন্তা করলেই নাকি তিনি এসে দেখা দেন। হেন যোগীকে দেখার আমার প্রবল কৌতূহল হয়। তাঁর সেই শিষ্যের চিঠি নিয়ে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তারপর বহুবার তাঁর কাছে গিয়েছি। পরে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একবার তাঁকে বলি, —আপনি তো সূক্ষ্মদেহে অনেককে দেখা দেন। আমাকে একবার দেখা দিন না।

তিনি বললেন—সবাইকে তো আমি দেখা দিতে পারি না।

— কেন?

— সে আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

বললাম, আমার দুর্ভাগ্য একটা অলৌকিক ঘটনার আমি সাক্ষী হতে পারলাম না।

তিনি বললেন, সূক্ষ্মদেহে আমি আপনাকে দেখা দিতে পারব না বটে, তবে সূক্ষ্মদেহে যে কোথাও যাওয়া যায় তার প্রমাণ দিতে পারব।

—যেমন?

—আপনি তো ধ্যান করেন?

—তা একটু আধটু করি।

—আপনি কখন ধ্যানে বসেন?

—রাত নটা নাগাদ।

—আজ যখন ধ্যানে বসবেন আমি যাব।

—বাক্সাড়া থেকে রাত নটায় টালিগঞ্জে আমার ওখানে!

—হ্যাঁ।

সেদিন রাত নটায় আমার ধ্যানে বসা হয়নি। বোধহয় রাত এগারোটা নাগাদ বসেছিলাম, কিন্তু তিনি আসেননি। মাস

দুয়েক পরে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা। বললাম, কই, আপনিতো সেদিন এলেন না?

—গিয়েছিলাম তো!

—এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, আপনিতো রাত সাড়ে নটায় ধ্যানে বসেন নি। তাই না?

—হ্যাঁ।

—আপনার কি কোন কিছু মনে হয়নি?

তখন মনে পড়ল হ্যাঁ আমার মনে হয়েছিল যে, কেউ যেন আমার দু বগলের নীচে হাত রেখে আমাকে উপরের দিকে টানবার চেষ্টা করছে। সে কথা তাঁকে বললাম।

তিনি বললেন, তবে?

—দেখা দিলেন না কেন?

—বলেছি তো সবাইকে দেখা দেওয়া যায় না। সবাইকে কেন দেখা দেওয়া যায় না — তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আর কোন তর্ক-বিতর্ক করিনি। তবে আমার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে যোগীরা সূক্ষ্ম দেহে বিচরণ করতে পারেন।''

প্রসঙ্গ (৬২)

এবার আমার (শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া) ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথা বলছি।

আমার জন্মকোষ্ঠীতে বিবাহের ব্যাপারে বেশ কিছু বাধা ছিল। বিবাহের ব্যাপারে আমার মা যোগাযোগ করতে আরম্ভ করেন। মেয়ে দেখার ব্যাপারে অনেক জায়গায় যেতে হয়েছিল যেমন দেউলটি, উলুবেড়িয়া, উত্তরপাড়া, বেহালা, কৃষ্ণনগর, শিবপুর, বাকসাড়া, সাঁতরাগাছি ইত্যাদি। এরই মাঝে একটি রবিবার সকালে গুরু মহারাজের কাছে বসে আছি। হঠাৎ গুরুদেব বললেন, ''প্রদীপ মাকে কষ্ট দিয়ে কেন বিভিন্ন জায়গায় পাত্রী দেখতে যাচ্ছিস। সপ্তাখানেকের মধ্যে যোগাযোগ হয়ে যাবে এবং তোর বাড়ীর এপাড়া ওপাড়া বিয়ে হবে।'' অদ্ভুতভাবে তিন চারদিন বাদে আমার স্কুলের বন্ধু হঠাৎ পাত্রীর দাদাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। পাত্রীর ছোড়দাকে আমি চিনতাম কারণ সেও আমাদের স্কুলেরই ছাত্র ছিল। যাই হোক মহাগুরুর কৃপায় আমাদের বিবাহ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হল।''

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন শ্রীশ্রীবাবা। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বাক্‌সিদ্ধ ও ভূত-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হন।

প্রসঙ্গ (৬৩)

একদিন সন্ধ্যেবেলা গুরুদেবের কাছে একাকী বসে আছি। কদিন ধরেই মনের মধ্যে একটা জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছিল, যে এতবড় সদ্‌গুরুর কাছে জীবনে অধ্যাত্ম পথে এগোতে পারব কি না! যদিও তখন আমার ক্রিয়া নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সেদিন গুরুদেবের কাছে বসে সেই চিন্তাতে ডুবে ছিলাম। হঠাৎ গুরুদেব আমাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, ''দ্যাখ্ বাবা প্রদীপ এজীবনে জাহাজ হতে না পারিস, তবে মজবুত একটা নৌকা হতে পারবি।'' তখন আমার মনে খুব আনন্দ হল। ভাবলাম, নৌকা হওয়াটাও কি সহজ ব্যাপার! এই নৌকার মাঝি হয়েই তো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহাসাধিকা সখীদের পার করে দিতেন। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃ-পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৫০ : 'মা কালী' কালো কেন?

উত্তর : পরমব্রহ্ম স্বরূপিণী মা পরমব্রহ্মের চিতিশক্তি — পরমব্রহ্মের গাঢ়-ঘন অন্ধকার আকাশের মধ্যে মায়ের বিদ্যুতের ঝিলিকের মত অস্তিত্ব অনুভব করেন যোগীগণ। তাই মা মোক্ষদায়িণী কালী কালো। ইনিই পরবর্তীতে কলনময়ী হইয়া কালরূপা ঈশ্বরী হন — তাই মা কালী (কাল + ঈ = কালী); পরমব্রহ্মের আদি প্রকাশরূপই 'কালী'।

প্রশ্ন ৫১ : ভক্তিযোগে 'total surrender বা পূর্ণসমর্পণ' কোন অবস্থাকে বলা হয়?

উত্তর : ভক্তিযোগে নবধাভক্তির আত্মনিবেদন বা পূর্ণসমর্পণেই 'ব্রহ্মসম্বন্ধ' স্থাপন হয় — ইহা পুষ্টিমার্গস্থিত মোক্ষমার্গের সাধন; এই সাধনের ফল কৈবল্যলাভ ও নিত্যভূমিতে স্থিতি। শ্রীভগবানের সঙ্গে কোনভাবে একবার আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন হইলে পরে সর্বদুঃখের বিনাশ সাধন হয়, এমনকি মায়িক আবরণ উন্মুক্ত হইয়া সত্তার চিরমুক্তি হয়। তবে কখনো কখনো শ্রীভগবানের নির্দেশে সেই সকল দিব্যসত্তা মর্ত্যলোকে বিশুদ্ধ দেহ ধারণ করিয়া জগতে 'ব্রহ্মসম্বন্ধ' দীক্ষাদানে প্রকৃত ভক্তযোগীকে শ্রীভগবানের ধামে লইয়া যান এবং জগতে শ্রীভগবানের অস্তিত্বের মহিমা প্রচার করিয়া যান। **—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২২)

যাবদ্দেহান্তকালোঽস্তি তাবদ্দেবি গুরুং স্মরেৎ।
গুরুলোপো ন বক্তব্যঃ স্বচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ।।৬৯

হে দেবি, যাবৎ দেহান্তকালঃ অস্তি, তাবৎ গুরুং স্মরেৎ; যদি স্বচ্ছন্দং ভাবয়েৎ (তহি) গুরুলোপঃ ন বক্তব্যঃ।।৬৯

হে দেবি, যে পর্য্যন্ত না দেহ শেষ হইতেছে, সে পর্য্যন্ত গুরু

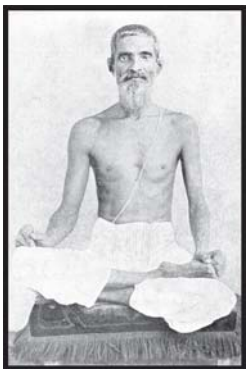

স্মরণ করিবে। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে গুরু লোপের কথা বলিবে না। ৬৯

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ দেহ মধ্যে মনও আছে; এই মনের ঊর্দ্ধগতিতে মনের লয় গুরুতে হয়; এবং অধোগতিতে জগতে লয় হয়। জগৎ ও গুরুর অংশ লইয়া মনের উৎপত্তি হইয়াছে; এই মনের জগতে লয় হইলে জীবের নরকে গতি হয়, এবং গুরুতে লয় হইলে, উহার উদ্ধার হইয়া উহা স্বচ্ছন্দভাব লাভ করে; তখন জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে (ঈশোপনিষৎ ১১ শ শ্লোক দেখ)। গুরুতে বিষয়-মল নাই বলিয়া তিনি স্বচ্ছ, এবং তাঁহাতে মিশিলেই স্বচ্ছন্দতা লাভ হইল। 'স্ব' অর্থে আত্মা এবং 'ছন্দ' অর্থে ইচ্ছা, গুরু আত্মস্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে মিশিবার ইচ্ছা হইলে, জগতের ইচ্ছার নাশ হইয়া স্বচ্ছন্দতা বা স্বাধীনতা এবং অমৃতত্ব লাভ হয়। জগৎ পরকীয় বস্তু। পরকীয় বস্তুতে মিশিবার ইচ্ছা হইলে যন্ত্রণা সহ জগতে গতি হইয়া জীব মৃত্যুবশে যায়।

গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন।।৭০

গুরোঃ অগ্রে কদাচন অসত্যঞ্চ ন বক্তব্যম্।।৭০

সত্যস্বরূপ গুরুসমীপে কদাচন অসত্য বলা চাহি না।।৭০

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সূক্ষ্ম মন অগ্রে কথা কয়, পশ্চাতে জড়-বাক্যের দ্বারা উহা প্রকাশ হয়, সে কারণ প্রকৃতপক্ষে মুখ কথা কহে না, পরন্তু মনই কথা কহিয়া থাকে। সত্যস্বরূপ গুরুকে লক্ষ্য করিয়া যখন সাধন-কার্য্য হইতেছে, তখন সত্য কথাই তাঁহার সমীপে বলা চাহি, অর্থাৎ অসত্য জাগতিক সম্পত্তি লক্ষ্য করিয়া সাধনকার্য্য হইলে, গুরুর সাধন হয় না, পরন্তু সম্পত্তিরই সাধন হয়; যথা — অর্থ লাভের জন্য 'ধনং দেহি' বলিয়া, মান লাভের জন্য 'মানং দেহি' বলিয়া, অথবা বিপত্তি উদ্ধারের জন্য 'ত্রাহি মাং' বলিয়া সাধন ইত্যাদি। চিন্তাযুক্ত হইয়া সাধন হইলে মনের বিষয়ান্তরে গতি হইয়া গুরুব্রহ্মের সাধন হয় না, গুরুধ্যানে থাকিয়া সাধন হইলেই গুরু-সাধন হয়।

যো বৈ হুঁ কৃত্য হুঁ কৃত্য গুরুং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
অরণ্যে নির্জ্জনে স্থানে স ভবেৎ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।।৭১

যঃ (পুরুষঃ) বৈ অরণ্যে (অথবা) নির্জনে (জনশূন্যে) স্থানে (স্থিতোঽপি) হুঁকৃত্য হুঁকৃত্য বাদতঃ (তর্কেন) গুরুং নির্জ্জিত্য (প্রবর্ত্ততে) সঃ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ভবেৎ।।৭১

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশে সদর্পে হুঁকার করিয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া এবং গুরুকে হীনভাবে দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহে, যথা - দেহমধ্যে প্রাণের সৃষ্টি করিতে পারি, আমিই ঈশ্বর, আমিই যজ্ঞ করিতে পারি, ইত্যাদি (গীতা ১৬ অঃ ১৪, ১৫ শ্লোক দেখ), সে ব্যক্তি অরণ্যে অথবা অন্য নির্জন স্থানে সাধন করিয়াও তাহার মনোমধ্যে বহু চিন্তা থাকায়, তাহার জনাকীর্ণ স্থানে সাধন হইতেছে বুঝিতে হইবে এবং তদ্রূপ সাধনে ব্রহ্মকে আত্মসমর্পণ করা হইতেছে না, পরন্তু ব্রহ্মকে আত্মউদরস্থ করিয়া রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হইতেছে। ৭১

মন চিন্তাশূন্য হইলেই স্থানও জনশূন্য হয় এবং বহু লোক মধ্যে থাকিয়াও কাহারও প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে, কেহ থাকিয়াও নাই বুঝিতে হইবে, কারণ মনোরূপী জীব সেস্থলে কাহারও সঙ্গ করিতেছে না, এবং দেহ জনশূন্য অথবা জনাকীর্ণস্থানে থাকিলে জীবের কোন রূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ জড়দেহের বোধশক্তি নাই।

...ক্রমশঃ

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

গীতা ভাবনা

(৩৭)

গীতা ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্ব :—

রামমোহনের পরে ব্রাহ্মধারাকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি রোজ গীতা পাঠ করতেন। ইনি রবীন্দ্রনাথকে বালক বয়সে গীতার শ্লোক মুখস্থ করিয়েছেন এবং একটি পাতায় অন্যান্য মন্ত্রের সঙ্গে গীতার বাণীও লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। রামমোহন ছাড়া অন্যেরাও গীতার অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর বিবিধার্থ সংগ্রহ গ্রন্থে লিখেছেন — 'বোধ হয় শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙালী গ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।' ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের আত্মীয়-সভার বিশিষ্ট ব্যক্তি বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিতদের সাহায্যে গীতার পদ্যানুবাদ করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা ১৩২২ সালে 'গীতা পাঠ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে গীতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — 'আমার কুটীরে বিনা তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে - ভগবদ্‌গীতা। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকচ্ছটা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে — আমাদের ক্ষুদ্র দীপের শিখা তাহা সমস্তের উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে।' সত্যেন্দ্রনাথ এর আগে ১৩১১ সালে গীতার গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বড় কাজ হল মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলকের লেখা গীতা রহস্যের অনুবাদ। ব্রাহ্মদের মধ্যেকার উপদল নববিধান সমাজের গৌরগোবিন্দ রায় 'গীতা প্রপূর্তি' নামে চার অধ্যায়ে গীতার ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ধারা থেকে সরে এসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিগ্রহ পূজায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং তিনি অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর পরমহংসের কাছে দীক্ষা নেবার পরে পুনরায় উপবীত ধারণ করেন। গীতার ভাষ্য না লিখলেও তাঁর উপদেশে গীতার শরণাগতির কথা উচ্চারিত হয়েছে। ব্রাহ্মদের তারাকিশোর উকিল পরে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের রামদাস কাঠিয়াবাবার শিষ্য হয়ে সন্তদাস বাবাজী হন এবং নিম্বার্ক মতানুসারে গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। অতএব আদিপর্ব থেকেই ব্রাহ্ম ধারায় গীতার প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনায় গীতা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে, যদিও গীতার কোন ধারাবাহিক আলোচনা বা ভাষ্য তিনি লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও গীতা নামক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়ে যেমন আলোচনা করব তেমনি বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতা বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপিত করব। একইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও গীতা প্রবন্ধও উপস্থাপিত হবে।

রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁদের কথা বললাম তাঁদের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ ও ধর্মের স্বরূপ বিষয় সর্বদাই যে মতের ঐক্য ঘটেছে এমন নয়, তবুও গীতার উপরে সকলের শ্রদ্ধাই ছিল অসীম।

গীতার নানা দিককে তাত্ত্বিকরা যেমন নানা ভাবে দেখেছেন তেমনি রাজনীতিবিদেরাও গীতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অহিংস আন্দোলন ভারতীয় ভাবধারার একটা বিশিষ্ট দিক যার সঙ্গে নরমপন্থী আন্দোলনকারী মহাত্মাগান্ধীর নাম বিশেষভাবে জড়িত। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি (জওহরলালের আত্মচরিতের অনুবাদক) মনে করেন যে গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রের প্রেরণা এসেছে গীতার থেকে। ১০/৫; ১৬/২,৩ ইত্যাদি শ্লোকের দিকে আলোচকেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভগবান অর্জুনকে নির্বৈর (১১/৫৫) হতে বলেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে আত্মত্যাগ ও আত্মতুষ্টির উপরে প্রতিষ্ঠিত তার মূলে ছিল যোগী হয়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত হয়ে ওঠা। অসহযোগ আন্দোলনের পিছনে গীতায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমির প্রেরণা কাজ করেছিল বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন। অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে অনশন প্রথার ভিত্তি হিসাবে পণ্ডিতেরা গীতার ২/৫৯ শ্লোকটির কথা বলেছেন। গান্ধীজীর ডাইরীতে গীতার বাণী অনেকবার এসেছে। গীতার ভাবসংশুদ্ধি হল গান্ধীর চিত্তশুদ্ধি। গান্ধীজী লণ্ডনে থাকার সময় থিওসোফিস্ট বন্ধুদের অনুরোধে গীতার পাঠ আরম্ভ করেছিলেন। পরে অবশ্য গীতা তাঁর কাছে নিত্যপাঠ্য হয়েছিল। 'আসক্তিযোগ' নামে গুজরাটী ভাষায় গীতার একটি সংস্করণও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধ শেষ হবার পরে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তিনি ভারতীয়দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন নতুন করে গীতাপাঠ আরম্ভ হল এবং সেই পাঠ এত গভীর ছিল যে ১৩ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই সময় গীতার বাণীকে তিনি নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন। যে কোন সমস্যার সমাধান তিনি গীতার মধ্যে খুঁজতে চাইতেন। গীতাকে মূলতঃ দার্শনিক

শাস্ত্র হিসাবে সকলের পথপ্রদর্শক বলে ভাবতেন তিনি। অর্জুন ও কৃষ্ণকথাকে ঐতিহাসিক বলে তিনি মনে করতেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলছে আমাদের হৃদয়ে, তাই গীতার ব্যাখ্যা হল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। অহংকার শূন্যতা ও অনাসক্তির সঙ্গে পুনর্জন্মবাদ গান্ধীকে প্রেরণা দিয়েছিল। 'গান্ধী গীতা'র ভাষ্যকার সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এই বিষয়ে গান্ধীর মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন —'দেহ রথ, রথী অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও লাগাম মন। রথ যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই কুরুক্ষেত্ররূপ হৃদয়ক্ষেত্র। দৈবী ও আসুরী হৃদয়স্থ এই দুই বৃত্তি দুই পক্ষ। এই যুদ্ধ নিয়তই মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে চলিতেছে। সেই যুদ্ধে যাহাতে দৈবী পক্ষই জয়ী হয়, তজ্জন্য ভগবান সারথি বেশে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান অজ্ঞ দেহী অর্জুনকে দিয়াছেন।' *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুর অতীত

আসক্তি ত্যাগে সংস্কার দূরীভূত হয়, সংস্কার দূরীভূত হলে মনের ভ্রান্তি অপগত হয়। ভ্রান্তিহীন মনে বৈরাগ্য আসে, বৈরাগ্যের ফলে মন পবিত্র হয়। মন পবিত্র না হলে 'শ্রদ্ধা' যা অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হবার প্রথম গুণ তা লাভ হয় না। শ্রদ্ধা হলো মনের স্বচ্ছতা। শ্রদ্ধাযুক্ত স্বচ্ছ পবিত্র মনে চৈতন্যের আলো প্রতিফলিত হয়। তখন সাধক বা যোগী ঐ চৈতন্য সমুদ্রে মনকে নিমজ্জিত করার জন্য পরম উৎসাহে, তীব্র মনঃশক্তি প্রয়োগের দ্বারা যে চেষ্টা চালান তাকেই তপস্যা বলে। এইরূপ তপস্যার ফলে আত্ম-উপলব্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। আসক্তিহীন মনের দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত প্রজ্ঞায় পৌঁছানোই হলো অধ্যাত্ম সাধনা। দৃঢ় বিশ্বাসই হলো শ্রদ্ধা। প্রথমে সাধক বিশ্বাস করেন এবং অনুভব করেন তিনি আছেন। এই বিশ্বাসই হলো সত্য উপলব্ধির বীজ। শ্রদ্ধার অর্থ 'শ্রৎ ধীয়তে অস্মিন্', অর্থাৎ সত্যকে নিজের মধ্যে ধারণ করা। পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ম্ সৎ সত্তা। অতএব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ পথে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার গুরুত্ব অপরিসীম।

বদ্ধ মনের গণ্ডী ভেঙে, স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে, একাগ্রতা সাধন দ্বারা সংকীর্ণ মনোরাজ্যের সীমা অতিক্রম করতে পারলেই মহাসত্য স্বরূপ অনন্ত জ্যোতি সমুদ্রের আভাস পাওয়া সম্ভব হয়। আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত, মনাতীত, বুদ্ধাতীত ও ধ্যানাতীত। যোগ সমাধিতে মনোলয় অবস্থায় যে সীমাহীন অনন্ত আত্ম বা চৈতন্য সমুদ্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাই নির্বাণ রাজ্য। এই নির্বাণ রাজ্যে চঞ্চল মন নিয়ে প্রবেশ করা যায় না। তাই উপনিষদের নির্দেশ, 'শান্ত উপাসীত' — শান্ত হতে হবে। শান্ত হবার দুটি পথ। দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ আসক্তিহীন, সৎচরিত্র ও শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রাণের সঙ্গে মন যেহেতু ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাই প্রাণের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে মনকে সংযত ও শান্ত করতে হবে।

এই পথ একটি শৃঙ্খলায় বাঁধা। শৃঙ্খলা ভঙ্গের দ্বারা কখনো মহাশূন্যতার অনুভব হতে পারে না। মহাশূন্যতা পরমাত্মা দ্বারা পূর্ণ। পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে যোগ সাধনা ও ধ্যানের দ্বারা শূন্যতার গভীরে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ করতে পারলে ধ্যাতা ও ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানী ব্যক্তি এবং ধ্যানের অবলম্বন বা বিষয় উভয়েই বিলুপ্ত হয়। তখন কোনো সম্বিৎ থাকে না। আপন দেহ, স্থান, কাল এমন কি সমস্ত জগতের অস্তিত্বও থাকে না। কিন্তু আমি 'আত্মা' এইরূপ শুদ্ধ অস্তিত্ব (Pure existence) অর্থাৎ শুধুমাত্র আত্মসত্তা বোধ জাগ্রত থাকে। এইরূপ শান্ত, সমাহিত অবস্থাই হলো সমাধি। গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবস্থায় নিত্য এরূপ ঘটে, কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মসত্তা বোধ থাকে না। এই সুষুপ্তি অবস্থাকে লক্ষ্য করেই ঋষিগণ জাগ্রত থেকে অভ্যাসের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ ধ্যানের পথে তুরীয় অবস্থায় সমাধিস্থ হয়ে সর্বত্র পরমাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। উপলব্ধি করেন তিনি অণু থেকে বৃহৎ সব কিছুর অন্তরে, আবার সব কিছুকে ছাড়িয়ে।

তাই ঋষি বললেন, —

''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধমানি দিব্যানি তস্থুঃ ...
বেদাহমেতাং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।''

অর্থাৎ, হে মানব! এই বিশ্বজগৎ হতেও যিনি বৃহৎ সেই পরব্রহ্ম আছেন প্রতি শরীরে, সর্ব বস্তুতে নিগূঢ়ভাবে, তিনি এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁকে জানলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। ঋষি আরো বললেন, — 'আমি জেনেছি অন্ধকারের পরপারে সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে। তাঁকে জানলে মৃত্যুকেও অতিক্রম করা যায়।'

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীতাপস বন্দোপাধ্যায়

কোথায় তোমরা চলেছ?

(স্বামী মুক্তানন্দ রচিত ইংরাজী পুস্তক 'Where Are You Going' **-এর বঙ্গানুবাদ)**

(৩)

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য—

হে বন্ধু, কোথায় চলেছ? কোথা থেকে তুমি এসেছ এবং তোমাকে কি করতে হবে? তুমি পরম সত্যের থেকে এসেছ কিন্তু তুমি তোমার মূল উৎস ভুলে গেছ। এখন সময় এসেছে সঠিক রাস্তায় ফিরে যাবার।

বর্তমান জগৎকে বলা হয় প্রগতিশীল কিন্তু কোন পথে এর প্রগতি হয়েছে? খুন, চুরি, মারামারি এবং ধ্বংসেরই বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে জাতিতে জাতিতে ঘৃণা, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রেষারেষি, সমাজের মধ্যে ঘৃণা, জাতিতে জাতিতে এবং শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা। লোকেরা সংস্কার এবং পরিবর্তনের কথা বলে কিন্তু এগুলির নামে তারা পরিবেশকেই ধ্বংস করে, নষ্ট করে পারিবারিক জীবন, এবং বৃদ্ধি করে স্বার্থপরতা এবং শত্রুতা। এমন পৃথিবীতে আমরা একটা জিনিস চাই এবং সেটা হল সত্যকারের মনুষ্যত্ববোধ। অথচ এটাই আমাদের নেই। কেন একজন মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়? কেন সে নিজের এবং অন্যের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করে? ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে কেন তারা রেষারেষি এবং শত্রুতার মধ্যে বাস করে? মানুষ এগুলি করে কারণ সে সত্যকার নিজেকে বোঝেনা বলেই। মানুষের অন্তরে যে মহত্ব আছে তা সে জানে না। সে নিজেকে ভাবে সে ভ্রান্ত, সাধারণ এবং দুর্বল। কোনো রকমে জীবনযাপন করবে তারপর মারা যাবে। অথচ যদি সে নিজের অন্তরের দিকে তাকায় সে উপলব্ধি করতে পারবে যে সমগ্র বিশ্বের দিব্যতা তার নিজের মধ্যেই রয়েছে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখন যে সত্যি অবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছেন, ভারতীয় দার্শনিকগণ হাজার হাজার বছর আগেই তা জানতেন—'সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একক শক্তিরই বিকাশ।' আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ যাঁরা আধ্যাত্মের সাধক ছিলেন, শক্তিকে চৈতন্য অথবা ঈশ্বর বলতেন। এই পরম চৈতন্যে নিজের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করলেন। স্থপতিকে কোনো কিছু তৈরী করতে হলে কাঠ, পাথর এবং অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু চৈতন্যের কোনো কিছু সৃষ্টি করতে বাহ্যিক উপাদানের প্রয়োজন হয় না। চৈতন্য নিজের মধ্যে থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি করতে পারে। আমরা সকলেই এই বিশ্ব চৈতন্যের অংশ। আমরা একে অন্যের থেকে ভিন্ন নয়, এবং ঈশ্বর থেকেও ভিন্ন নয়। যদি কেউ আমের বীজ বপন করে সে ঐ গাছ থেকে আমই পাবে লেবু কখনোই পাবে না। সেই রকম, যা কিছু ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি তা ঈশ্বর ভিন্ন হতে পারে না। মানুষের অন্তরে একটা দীপ্ত উজ্জ্বলতা আছে যা সূর্যের প্রভাকেও ছাপিয়ে যায়। এই অন্তঃচৈতন্যই সেই বস্তু যে নাকি সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি এবং প্রাণবন্ত করেছে। কিন্তু আমরা এই বিষয়ে সচেতন নই। যদিও আমরা এই চৈতন্যের থেকেই এসেছি কিন্তু আমরা নিজেদের সম্বন্ধে সেই বোধকে হারিয়ে ফেলেছি। একবার যখন আমি বোম্বাই শহরে ছিলাম কতগুলি ছেলের মুখে একটা সিনেমার গান শুনি। এখনও পর্যন্ত আমার সেটি মনে আছে —

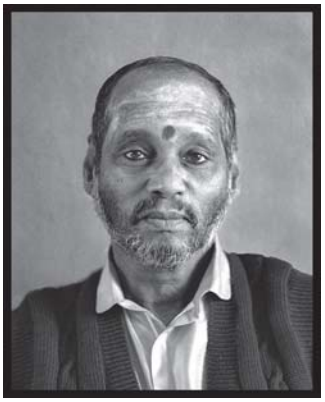

"ও মানুষ, তুমি বদলেছ কেমনে?
পৃথিবী তো বদলায়নি, জলের তো পরিবর্তন হয় নি,
আগুন-বায়ু-শূন্যও তো অপরিবর্তিত আছে,
সূর্য চন্দ্র তো একই আছে,
জীবজন্তু তো বদলায়নি,
বৃক্ষরাজির তো হয়নি কোনও পরিবর্তন।"

আমরা বদলেছি কেমন করে? আমাদের ধারণা অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু হয়েছি। আমরা আমাদের পুরুষ বা স্ত্রী, ধনী বা দরিদ্র বলে ভাবি। আমরা নিজেদের শিক্ষক, সৈন্য, মনোচিকিৎসক বলে ভাবি। আমরা মনে করি আমরা যুবক বা বৃদ্ধ। স্থূল বা রোগা, সুখী বা দুঃখী, আমরা নিজেদের ভাবি — আমেরিকান, ভারতীয়, রাশিয়ান বা আরবী। হিন্দু বা খ্রীষ্টান, মুসলমান বা ইহুদী। কিন্তু আসলে, আমাদের সকলের অন্তর্নিহিত সত্যটি একই। আমরা সকলে একই বীজ থেকে এসেছি, সেই বীজটা হল — ঈশ্বর। আমরা কেবল বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি। যদি আমরা সেই

ভূমিকাকে ভেদ করে আমাদের স্বদিব্যতাতে পৌঁছাতে পারি, তখনই আমরা পুনরায় জানতে পারব যে স্বরূপতঃ আমরা ঈশ্বর।

প্রকৃত মানুষ হবার স্বাধীনতা—একজন মানুষের সবকিছু হবার স্বাধীনতা আছে। সে তার নিজ শক্তিতেই নিজেকে মহান করে তুলতে পারে, আবার নিজেকে বিনষ্ট করতেও পারে। নিজের শক্তিতেই সে স্বর্গে পৌঁছাতে পারে আবার গহ্বরে পতিত হতে পারে। বস্তুতঃ মানুষের শক্তি এত বিশাল যে সে নিজেকে ঈশ্বরে রূপান্তর করতে পারে। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই সুপ্তভাবে অবস্থান করছেন, এবং প্রত্যেকেরই শক্তি আছে সেটা অনুভব করার। কিন্তু লোকেরা কি করে? নিজের মধ্যে সেই বিশাল শক্তিকে জানার পরিবর্তে তারা পান-ভোজনে অন্যের সঙ্গে মারামারি এবং ইন্দ্রিয়গত আনন্দের পিছনে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। দুই বা তিনটি সন্তান লাভ করল, সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করল, ভাবল সে তার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। জন্তু-জানোয়ারও এই জিনিসই করে, পৃথিবীর প্রত্যেক জীবই পান-ভোজন করে। প্রত্যেক প্রাণীরই পৃথিবীতে একটা পারিবারিক জীবন আছে। জন্তু বনে যায়, কাজ করে আবার ফিরে আসে সঙ্গী ও বাচ্চাদের সঙ্গে আনন্দ করতে। একই ভাবে মানুষ কর্মক্ষেত্রে যায়, কাজকর্ম শেষ করে, ফিরে আসে এবং পারিবারিক জীবন উপভোগ করে। মনুষ্য জাতি যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, কুকুর, গাধা, হাতি, উট, ঘোড়া, পাখি প্রভৃতিদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে পারে। সেইজন্য এক মহান সাধিকা, 'ফুলী' বলেছেন, ''যদি তুমি তোমার নিজের আত্মাকে লাভ করতে না পার, যদি তুমি সেই চরম শান্তির স্বাদ না পাও, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি? কুকুর, শূকররা কি বাঁচে না? গাছপালা কি বাঁচে না? পাহাড় পর্বত পৃথিবীতে টিকে থাকে না?'' তাহলে কি সেটা! যা নাকি মানুষকে দুর্লভ (অনন্য) করে তোলে? কেবলমাত্র মানুষেরই সেই ক্ষমতা আছে সেই দিব্য চৈতন্যকে জানার। যা নাকি তার নিজের অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে। কেবলমাত্র মানুষই পারে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে। সেই জন্যই 'আমি কে?'—এরই আবিষ্কারে আমরা আমাদের মনুষ্য জীবন ব্যবহার করব। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, ''কেবলমাত্র সেই সত্যকার মানুষ যে গভীরভাবে চিন্তা করে 'আমি কে? কেন আমি জন্মেছি? কে আমাকে সৃষ্টি করেছে এবং আমার কর্তব্য কি'?'' যদি কোনো লোক নিজের আত্মাকে জানতে না পারে, যদি তার নিজেকে জানা কেবলমাত্র তার স্থূল শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে তাকে সত্যকারের মানুষ বলা যাবে না। প্রসিদ্ধ সন্ত কবীর বলেছেন, ''যদি তুমি তোমার নিজের আত্মাকে দেখতে না পাও, যদি তুমি হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে না পার, মনের মলিনতা ধুয়ে ফেলতে না পার, তাহলে শুধু মানুষ হয়ে জন্মিয়ে কি হবে?''

...ক্রমশঃ

—বঙ্গানুবাদ শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা

(৫)

সদ্‌গুরু মাহাত্ম্য— (*পূর্ব প্রকাশিতের পর....*)

শ্রীশ্রীমা: হিমালয়ে যাঁরা সাধনা করেন, সে রকম ভাল অবস্থার যোগী, যিনি সবিকল্প সমাধি অবস্থায় আসীন রয়েছেন তাঁদেরকেও তাঁদের সদ্‌গুরুরা বলেন ''অভী ভী তেরা মনমেঁ খোট হ্যায়। হমারা গুফামেঁ তেরা প্রবেশাধিকার নহীঁ হ্যায়।'' —তাহলেই বোঝো সদ্‌গুরুর বিশ্বস্ত হওয়া কত কঠিন। যতক্ষণ না নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় উপনীত হচ্ছে যোগী, ততক্ষণ অষ্টপ্রকৃতির খেলা সত্তায় থাকে; ততক্ষণ পরিপূর্ণ নির্মল হওয়া যায় না। পরিপূর্ণ নির্মল-সত্তা না হলে সদ্‌গুরুগণের হৃদয়ের প্রিয় হওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক জগতে সদ্‌গুরু ভিন্ন শিষ্যকে শিবাবস্থা প্রদান করতে কেউ পারেন না। তাই বলা হচ্ছে, সদ্‌গুরুকে বিচার করতে যেও না, নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারো কিন্তু তাতেও জীবনের মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। অতএব আধ্যাত্মিক পথে সদ্‌গুরুর শরণাগতিই একমাত্র পথ। সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য ও শরণাগতিতেই যোগ সাধনায় উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। সাধারণ মানুষের ধারণাই নেই যে মহাত্মাগণ কি প্রকার হন! মহাত্মাগণ যতই সরল হন ততই কঠিন হতে পারেন শিষ্যকে শিক্ষা দেবার সময়। তাই মনেপ্রাণে তাঁদের প্রতি সমর্পণভাব রাখতে হয়। সদ্‌গুরু প্রদত্ত চিন্ময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বীজাকারে শক্তি আকারে তোমার মধ্যে গ্রথিত থাকলে তখন সেই fire spark তোমাকে কূটস্থ-অভ্যন্তরে আকর্ষণ করবে। কূটস্থ কি? — সদ্‌গুরু দীক্ষাদানের সময় তোমায় বুঝিয়ে দেবেন। কূটস্থ-দর্শন হলেই তখন থেকে আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু হয়।

সাধন করতে করতে তখন ক্রমশঃ মায়াকে চিনবে। যতই সদ্‌গুরুকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসবে ততই মায়ার স্বরূপ তোমার সম্মুখে প্রস্ফুটিত হবে। তোমার মধ্যে মায়ার আবরণটি কেমন, তখন তাও বুঝতে পারবে। মায়ামুক্ত না হলে তো আত্মধ্যান হয় না। এই মায়াযুক্ত এক একটি জীব তোমরা। সেই মায়ার মধ্যে থেকে যোগী হবার চেষ্টা করছ। কি হতে পারে? .....

আমরা ওঁকারের সাধনা করি। ওঙ্কার মন্ত্র মুখে উচ্চারণ করি না। ধ্যান লাগাতার হবে, ওই ওঙ্কারের সুরে যদি মন দিতে পারো। প্রত্যেকের ভিতর যে শব্দব্রহ্মের সুর রয়েছে, সেই ওঙ্কারকে, নাদ কে, উত্থিত করার জন্য সাধনা করা প্রয়োজন, তপস্যা করা প্রয়োজন। ওঙ্কার ছাড়া কি করে ধ্যান হতে পারে? আত্মজ্যোতির মধ্যেও তো ওঙ্কার রয়েছে। প্রণব ছাড়া ধ্যান চিন্ময় হয় না। মন্ত্রের সব বীজরূপী অক্ষর প্রণবেই লয় হয়ে যায়। আর তোমার দেহটাও হচ্ছে প্রণবরূপী অক্ষরের আকার স্বরূপ। আমাদের দেহাভ্যন্তরের সুষুম্না মার্গ প্রণব অক্ষরাকার স্বরূপ। সেই প্রণবরূপী দেহকে কেবলী প্রাণায়ামের দ্বারা ভেদ করতে হয়। অর্থাৎ, সুষুম্না পথে সব গ্রন্থিগুলিই ভেদ করতে হয়। বিনা দীক্ষায় শুধু spark দেখেছি আর ভাবছি অনেক কিছু হচ্ছে, ওইভাবে হয় না। এর চেয়ে যে রকম আছো, সে রকম যদি মনে করো যে আনন্দে আছি, তাহলে সেইভাবেই থাকো। 'চৈতন্য-শক্তি বিনা কোন কিছুরই সম্বর্দ্ধন সাধিত হয় না' — এ কথা ধ্রুব সত্য জেনো। চৈতন্যশক্তি এমন বস্তু যে চৈতন্য অগ্নির একটি ধূনী থেকে আরেকটা ধূনীতে আগুন জ্বালানো হয়। সেইরকম সদ্‌গুরুর ধূনী থেকে নিয়ে সদ্‌গুরু আরেকটি ধূনীতে অর্থাৎ শিষ্যের ধূনীতে চৈতন্য প্রদান করেন। সেই সদ্‌গুরু প্রদত্ত চৈতন্য জন্মজন্মান্তরে থেকে যায় কারণ চৈতন্যশক্তি কখনোই বিনষ্ট হয় না। অনেক সত্তায় মায়া ও প্রারব্ধের কারণে চিদগ্নি মলিন আবরণে সত্তায় চাপা পড়ে যায়, তবুও অন্তরে থাকেই। এইসব মানুষের জন্মজন্মান্তরে গুরুকরণের শুভেচ্ছা সহজেই সত্তায় জাগ্রত থাকে।

...ক্রমশঃ

পুরাণ কথা

মহাবলশালী নৃপ দেবসেন

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শিবানুচর ভৈরবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে 'সুবেশ' নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুবেশ গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে সুবেশের 'রুরু' নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। রুরুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে 'বাহু' নামক পুত্রের জন্ম হয়। বাহুর চারি পুত্রের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ হইল 'কুমুদ'। এই কুমুদের পুত্র হইলেন মহাবলশালী 'দেবসেন'। তিনি যৌবনাশ্ব মান্ধাতার কন্যা কেশিনীকে বিবাহ করেন। দেবসেন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে গমন করিয়া মহাদেবের আরাধনায় মগ্ন হন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব বর দিতে চাহিলে দেবসেন বলিলেন, ''যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে ততদিন আমার বংশীয়েরা কাশীর অধিপতি হইবে এবং আপনিও তাবৎকাল আমার বংশীয়দের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন।'' দেবসেনের ঔরসে কেশিনীর গর্ভে সুমনা, বসুদান, ঋতধৃক, যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী নামে সাতজন পুত্রের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে দেবসেন তাঁহার পুত্রদের উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া সপত্নীক বিদ্যাধর লোকে গমন করেন।

বিদ্যাধর লোক সম্বন্ধে :— এই লোকে বিদ্যাধরগণ বসবাস করেন। এঁরা সূক্ষ্মদেহী দেবযোনি বিশেষ। এঁরা সঙ্গীত বিশারদ। বিদ্যাধরলোক আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে অবস্থিত। সাধারণত বিদ্যাধরগণ সকলের মঙ্গল করেন। এই লোকেও রাজন্য-প্রথা প্রচলিত। পুরাণে পাওয়া যায় যে বিদ্যাধরগণ ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাদের চেহারা বদলাইতে পারেন বলিয়াই তাঁহারা 'কামরূপী' নামে অভিহিত। মনুষ্যগণের সঙ্গে বিদ্যাধরদের বিবাহও হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও বিদ্যাধরদিগের কথা পাওয়া যায়। ইহারা গৌরবর্ণ এবং দ্বিভূজ, চেহারা অতি সৌম্য এবং সুন্দর। বিদ্যাধরলোক স্বর্গতুল্য সুখময় লোক। কামনা-বাসনা সম্পন্ন পুণ্যবানজনেরা বিদ্যাধরলোকে গমন করিতে সক্ষম হন।

(কালিকা পুরাণ হইতে সংগৃহীত কাহিনী)

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩৫)

দেবতা বিষ্ণু— (*পূর্ব প্রকাশিতের পর...*)

অথর্ববেদেরই অপর একটি মন্ত্রে সূর্যরূপী বিষ্ণু একপাদ হয়েও দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, ষট্‌পাদ হয়ে বিচরণ করেন এরূপ উক্তি পাই—

একপাদ্ দ্বিপাদ ভূয়ো বিক্রমে
দ্বিপাৎ ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
দ্বিপাদ্ধ ষট্‌পদো ভূয়ো বিচক্রমে ত
একপদস্তস্বং সমাসতে।।

(অথর্ব সং ১৩/২/২/২৭)

এসব পাদের তাৎপর্য কি? এক বৎসর হল বিষ্ণুর একপাদ, উত্তর ও দক্ষিণায়ণ হল দ্বিপাদ, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও অগ্নি তাঁর তিনপাদ, ছয় ঋতু অথবা সূর্য, বিদ্যুৎ বাড়বাগ্নি, আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি তাঁর ছয়পাদ।

বেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কৃষ্ণ যজুর্বেদে বিষ্ণুর বামন হয়ে লোক জয় করার আখ্যান আছে। যজ্ঞ কর্মে তাঁর উদ্দেশ্যে বামন বা ক্ষুদ্র পশু উৎসর্গের বিধান এজন্য দেওয়া হয়েছে। শুক্ল যজুর শতপত ব্রাহ্মণে (শতপথ ১/২/২/১) বামনের উপাখ্যান থাকলেও পাদবিক্ষেপ না করে পৃথিবী ব্যাপ্ত করার উপাখ্যান বলা হয়েছে। অন্যান্য বৈদিক উপাখ্যানের মত এই উপাখ্যানটিও তাৎপর্যের দিক থেকে একই প্রকার।

আখ্যানটি হল — প্রাজাপত্য যাগের সময় দেবতা ও অসুরেরা পরস্পর বিবাদ করছিলেন। দেবতারা শক্তিহীন হয়ে পড়ায় অসুরেরা ভাবল এবার পৃথিবীর আধিপত্য তাদেরই হয়ে গেল। দেবতারা বিষ্ণুকে অগ্রবর্তী করে অগ্রসর হলেন। অসুরেরা তাঁকে জানাল যে তাঁদেরও যজ্ঞে ভাগ চাই। অসুরেরা আলোচনার সময় জানাল যতদূর পর্যন্ত বিষ্ণু শয়ন করতে পারবেন ততটুকু জায়গাই কেবল দেবতাদের দেওয়া হবে। বিষ্ণু তখন বামন হয়ে ছিলেন বলে অসুরেরা ভাবল যে দেবতারা অল্প স্থানই পাবেন। দেবতারাও এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন কারণ যজ্ঞের উপযোগী স্থান তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন মন্ত্রে বিষ্ণুকে নানা দিকে স্থাপন করা হল। বিষ্ণুর শয়ন করায় ও সর্ব ব্যাপ্ত হওয়ায় সব দিকই দেবতাদের হল। ঋক্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কিন্তু বিষ্ণুর তিনটি পাদবিক্ষেপের আখ্যানই পাওয়া যায় (৬/১৫)। জগতকে বিভাগ করার সময় ইন্দ্র দেবতা ও অসুরদের বললেন বিষ্ণু যতটা জমি তাঁর তিনটি পদবিক্ষেপের দ্বারা অধিকার করতে পারবেন ততটুকুই কেবল দেবতারা পাবেন, বাকি ভূমি পাবে অসুরেরা। অসুরেরা বামন বিষ্ণুকে দেখে এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গিয়েছিল কারণ তারা ভাবল - এ তিন পায়ে কতটুকুই বা জমি পাবে। কিন্তু বিষ্ণু তিন পাদে জগৎ, বেদ ও বাক্য অধিকার করে নিলে অসুরদের আর কিছুই রইল না।

মূল বৈদিক প্রকৃতি তত্ত্বমূলক আখ্যান কিভাবে বিভিন্ন বেদে বিভিন্ন ব্রাহ্মণভাগে ও পুরাণে বিস্তৃত হয়েছিল তা দেখাবার জন্যই নানান আখ্যানের রূপগুলিকেই আমরা তুলে ধরলাম। বৈদিক সাহিত্যে সূর্য বিষ্ণুর সম্পর্কিত আরেকটি অপূর্ব আখ্যান শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরিয় আরণ্যক (৫/২) ইত্যাদি স্থানে আমরা লক্ষ্য করি বিষ্ণু অসুরদের কাছ থেকে পৃথিবী অধিকার করে নিয়ে নিজের ব্যাপক শক্তির প্রমাণ রেখেছিলেন। তিনি চার দিকে চেয়ে তাঁর মত শক্তিমান আর কারোকে দেখতে পেলেন না। তখন জ্যা পরানো ধনুকের উপরে নিজের গলাটা রেখে তিনি বিশ্রাম নিতে থাকলেন। যেহেতু অসুর বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্ব বিষ্ণুই দাবি করেছিলেন, দেবতাদের কোন কৃতিত্বই দেন নি তাই দেবতারা বিষ্ণুর উপরে ক্রোধান্বিত ছিলেন। তাঁরা পিঁপড়েদের বললেন - তোমরা ধনুকের ছিলাটা কেটে দাও। উভয়ের বুদ্ধিমত পিঁপড়েরা ছিলা কেটে দিলে ধনুকটা ধ্রাং শব্দ করে যেই সোজা হয়ে গেল তক্ষুনি বিষ্ণুর মাথাটা কেটে আকাশে চলে গেল। সেই মাথাটাই হল সূর্য।

বৈদিক বিষ্ণুর বিবর্তন আলোচনা করতে বসে পুরাণের গয়াসুরের উপাখ্যান বলতেই হয়। এই পৌরাণিক আখ্যান সামান্য পরিবর্তিত আকারে বায়ু, গরুড়, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণেও পাওয়া যায়। এই আখ্যানগুলির মধ্যে বায়ুপুরাণের ১৬০ অধ্যায়ে কথিত আখ্যানটিকে পণ্ডিতেরা প্রাচীনতম আখ্যান বলে মনে করেছেন। গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্মে যেহেতু স্বয়ং বিষ্ণুর অবস্থান তাই সমস্ত ভারত থেকেই সকল বর্ণের তীর্থ যাত্রীরা বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে আসেন। কীকট দেশ বৈদিক ধারায় অপবিত্র হলেও এই বিষ্ণুপাদের মাহাত্ম্যে তার খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। বায়ু পুরাণের আখ্যানটি হল — গয়াসুর হাজার বছর ধরে তপস্যা করার ফলে যখন ত্রিলোক কম্পিত, তখন বিষ্ণু গয়াসুরের কাছে এলেন। গয়াসুর প্রার্থনা করলেন সে যেন ত্রিলোক-পবিত্র হয়ে ওঠে। ফলে তার স্পর্শে সব পাপী মুক্ত হওয়ায় যমপুরী

শূন্য হয়ে গেল। ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহে যজ্ঞ করতে চাইলে সে নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করল। কিন্তু যজ্ঞের ফলে তাপিত হয়ে তার দেহ কাঁপতে থাকল। দেবতারা তার উপরে চাপলেন। বিষ্ণুর দেহ থেকে নির্গত শিলাখণ্ডও চাপান হল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবাই তার উপরে অবস্থিত হয়ে যখন অসুরকে বর দিতে চাইলেন তখন গয়াসুর জানালেন - যতদিন পর্বত, চন্দ্র, তারকা থাকবে ততদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যেন তাঁর উপরে অবস্থান করেন। অগ্নি-পুরাণের কাহিনীতে আছে — বিষ্ণুর পদচিহ্ন স্থাপিত হয়েছিল গয়াসুরের উপরে। গয়শিরে বিষ্ণুপদের কথা ঔর্ণবাভ নামক আচার্য বলেছিলেন বলে নিরুক্তকার যাস্ক জানিয়েছেন। এই গয়শির হল অস্তাচলগামী সূর্য। পুরাণের আখ্যানে গয়াসুরের দেহে যজ্ঞানুষ্ঠান, বিষ্ণুপদ স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা যজ্ঞের সঙ্গে তার সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্‌গুরু প্রফুল্ল ঠাকুর প্রসঙ্গ

দীক্ষা প্রসঙ্গে এক সহকর্মীকে কিছু বলতে গিয়ে আরেকজন সহকর্মী বলে উঠলেন,''আপনি দীক্ষিত?'' বললাম, ''হ্যাঁ।'' ওনার পরবর্তী প্রশ্ন, ''কোথা থেকে?'' উত্তর দিলাম, ''রাজগীর রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমের বর্তমান চেয়ার পার্সন শ্রীমৎ স্বামী নিগমাত্মানন্দ পুরী মহারাজের কাছ থেকে।'' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সহকর্মী বললেন, ''১৯৯২ সাল থেকে আমিও দৌড়াচ্ছি একজন সত্যিকারের সাধকের সন্ধানে, কিন্তু এখনকার দিনে আর তেমন সাধকের সন্ধান পাওয়া যায় না, হয় প্রতারক আর না হলে শুধু তত্ত্বকথা,'' শুনে ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বললাম ''না মশাই, এখনও তেমন সাধক আছেন যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন আর সৌভাগ্যবশতঃ আমি তেমন একজনের থেকেই দীক্ষিত।'' সঞ্জয়দা চুপ করে শুনছিলেন কিন্তু জয়ন্তদার চোখটা চক্‌চক্‌ করে উঠল বুঝলাম উনি খুব আগ্রহী, বললাম, ''গুরুপ্রসঙ্গে কিছু বলার আগে পরমগুরু প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করব, আপনি মাতৃসাধক রামপ্রসাদের নাম শুনেছেন?'' উত্তর এল ''হ্যাঁ''। ''মা কালী স্বয়ং ওনার মেয়ের রূপ ধারণ করে বেড়ার পিছন থেকে দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।'' —''হ্যাঁ, সেটা শুনেছি কিন্তু সে তো রামপ্রসাদের কথা,'' বললেন জয়ন্তদা। ''আমার গুরুমহারাজের বাবাও ওই রকমেরই একজন মহাপুরুষ ছিলেন।'' গল্প জমে উঠল সকাল ৭:২০র উলুবেড়িয়া লোকালে, শুরু করলাম আমার পরমগুরু প্রসঙ্গ।

—''উনি ছিলেন একজন ব্রহ্মবিদ্‌ বরিষ্ঠ পুরুষ, বহু পথে আর বহু মতে ঈশ্বর সাধন করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। ওনার যোগীগুরু ছিলেন শ্রীমতিলাল রায় যিনি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরির যোগশিষ্য। এছাড়াও মতিলালবাবার আরো অনেক গুরু ছিলেন। প্রফুল্ল ঠাকুর প্রথমে ঋষি অরবিন্দের integral যোগ (রাজ যোগের একটি পর্যায়)-এ সিদ্ধিলাভ করেন। জগৎজননী মা সারদার কোনও একজন শিষ্য যাঁর নাম আমরা জানি না প্রফুল্ল ঠাকুরকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। এরপর প্রফুল্ল ঠাকুর শৈব, বৈদিক এবং তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধক নন্দদুলাল বাবাজীর কাছ থেকে বৈষ্ণব সাধন শুরু করেন। কৃষ্ণ সাধনায় উনি দ্রুত এত উচ্চ পর্যায় লাভ করেন যে নন্দদুলাল বাবাজী প্রফুল্ল ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাপ করতে না পেরে নিজের গুরুর কাছে তাঁকে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব যা মধুরভাব বলে পরিচিত সেইভাবে সাধন করে প্রফুল্ল ঠাকুর পরিপূর্ণতা লাভ করেন। ঠাকুর নিগমানন্দ সরস্বতী যে চতুর্বিদ সাধনের কথা বলেছেন, 'যোগ, তন্ত্র, জ্ঞান এবং ভক্তি' তার সবকটিতেই তিনি পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন।''

এবার সঞ্জয়দা আর জয়ন্তদা, দুজনেই উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করেন, ''ওনার জীবনের কিছু অলৌকিক ঘটনা কি আছে?'' মনে মনে হাসলাম, ভাবলাম সত্যিই তো যোগীরা অলৌকিক ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষের কাছে আত্মপরিচয় কখনো কখনো দিয়ে থাকেন। বললাম, ''বলব, তবে প্রথমে বলি আমার গুরুমহারাজ বলেন 'এজগতে সবই লৌকিক কারণ মানুষই সব পারে আর করে। যদি লোকের দ্বারা সবই হয় তবে সবই লৌকিক, অলৌকিক কিছুই নেই'।''

ওদের মুখ দেখে বুঝলাম, ওরা তত্ত্বজ্ঞানে সত্যিই আগ্রহী নয়। তারমধ্যে আমার আবার অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, কি বলতে কি বলে দেব, তাই জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই তার থেকে রসের ঘটনায় আসি, যা মানুষের কাছে অলৌকিক কিন্তু যোগীর কাছে সামান্য বিভূতিমাত্র। এবার শুরু হল প্রফুল্ল ঠাকুরের জীবনের কিছু অলৌকিক ঘটনাবলী।

''আমাদের আশ্রমটি কিংকরবাটী গ্রামে। ওটা প্রফুল্ল ঠাকুরেরই প্রতিষ্ঠিত। ওখানে একটা রাধা গোবিন্দ মন্দির

আছে। প্রফুল্ল ঠাকুর ছিলেন গৃহী সাধক। 'হাওড়া গুডস্'-এ চাকরী করতেন। একদিন সকাল বেলা প্রফুল্ল ঠাকুর প্রাত্যহিক পূজা শেষ করে অফিসের জন্য বেরুচ্ছেন তখনই এক ভিখারী এসে হাত পাতল বলল, 'একটু প্রসাদ দেবে গো ঠাকুর।' প্রফুল্ল ঠাকুর বললেন পিছনের গাছ থেকে কলাপাতা কেটে নিয়ে আসতে। ভিখারীটা কলাপাতা নিয়ে এল প্রফুল্ল ঠাকুর তাকে পাতা ভরে প্রসাদ দিলেন। ভিখারী আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল। সেদিন সারাদিন প্রফুল্ল ঠাকুরের মন উচাটন হয়ে রইল। রাতে বাড়ী ফিরে কি যেন মনে হল তাঁর বাড়ীর পিছনে গিয়ে দেখলেন সবচেয়ে উঁচু কলাগাছের সর্বোচ্চ পাতার উপরের দিকটা কাটা। এটা কি করে সম্ভব! মানুষ নাগাল পাবে কি করে ওই পাতার। ঠাকুর ঘরে গিয়ে ধ্যানে বসতেই দেখলেন ভিখারীর রূপ ধরে স্বয়ং মধুসূদন এসেছিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা বলি, ''সেদিন অফিস থেকে বাড়ীতে না এসে সোজা গোবিন্দ মন্দিরে চলে গেছেন প্রফুল্ল ঠাকুর। অনেক রাত অবধি গোবিন্দ মন্দিরে বাগানের মাটি তৈরী করার পর খেয়াল পড়ল বউ বলেছিল তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গরুর গাবজাল কেটে দিতে। ভাবলেন, 'সর্বনাশ, কি হবে?' বাড়ী ফিরছেন আর গোবিন্দকে বলছেন 'দেখো যেন অশান্তি না হয়।' বাড়ীতে ঢুকতেই যমুনাদেবী চা এনে বললেন, 'গরু খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে, খুব ভাল কেটেছো।' প্রফুল্ল ঠাকুরের তো চোখ ছানাবড়া। 'কি বলছ, বড় বৌ আমি তো এই এলাম।' যমুনা দেবী বললেন, 'কি যা তা বলছ! এই তো তুমি গাবজাল কাটলে আমি চা-এর কথা বলায় তুমি হ্যাঁ বলে চলে গেলে।' অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রফুল্ল ঠাকুর দেখলেন সত্যিই গরুতে ছোট্টো ছোট্টো করে কুচি করা গাবজাল খাচ্ছে । হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, 'বড় বৌ তুমি তাঁকে চিনতে পারলে না! এত আপন করে সে দেখা দিল তাও পারলে না।'

আরেক দিনের কথা -''সেদিন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে আর প্রফুল্ল ঠাকুর যজমানের বাড়িতে পুজো করতে যাবেন বলে সুন্দর ফতুয়াটা রোয়াকে বৃষ্টির মধ্যেই শুকোতে দিলেন বললেন, 'এটাই পরে যাব।' যমুনা দেবী ব্যাপার দেখে বড় ছেলেকে বললেন, 'তোর বাবার মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে।' প্রফুল্ল ঠাকুর হাসতে হাসতে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হল, মেঘ অপসারিত হয়ে রৌদ্র ঝলমল করে উঠল। রোদের এত তাপ বেড়ে উঠল যে রোদে দাঁড়ানো দায়। ফতুয়াটা শুকালো। এবার প্রফুল্ল ঠাকুরের পুজো শেষ হল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে ওই ফতুয়াটা পরে চললেন যজমানের বাড়ী।''

আরেকবার সেবার দেশে বন্যা পরিস্থিতি, চারিদিক ডুবে যায় যায়। হঠাৎ প্রফুল্ল ঠাকুর রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসে বললেন, 'জল এর উপরে আর উঠবে না।' বন্যার জল সত্যিই আর বাড়ল না। রক্ষা পেল কিংকারবাটী গ্রাম।

এরকম অসংখ্য অগুন্তি অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী ওই গ্রামের মানুষ আর তাঁর পরিবারের মানুষজন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যারা সঙ্গে ছিলেন তারা প্রতি মুহূর্তে তাঁর অলৌকিকত্ব যোগবিভূতি আর সর্বোপরি অনন্ত ভালবাসার নিদর্শন পেয়েছেন।

আমার গুরুমহারাজকে উনি যোগশিক্ষা এবং বৈষ্ণব সাধনের শিক্ষা দেন এবং মূলতঃ ওনার আদর্শেই গুরুমহারাজের জীবন সুগঠিত হয়। মানুষ হিসাবে প্রফুল্ল ঠাকুর যতটা নরম ছিলেন গুরু হিসাবে ছিলেন ততটাই কঠিন। রাধাভাবে সাধন করতে করতে উনি রাধার সাথে একীভূত হন। গুরুমহারাজ বলেন ওই সময়ে 'বাবার দেহের আর মনের যে পরিবর্তন হয়েছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।' শ্রীকৃষ্ণকে উনি প্রিয়তম হিসাবে লাভ করেছিলেন।

ইংরাজীর ১৯৭১ সালে এই মহাযোগী মহাসমাধি লাভ করেন। সমাধি মন্দিরটা নির্মিত হয়েছে গোবিন্দ মন্দিরের ঠিক পাশে। প্রফুল্ল ঠাকুর দেহরক্ষার পর গুরুমহারাজকে বলেছেন যে উনি তিনশত বছর জাগ্রত অবস্থায় থাকবেন। তাই এখনো কোন মানুষ যদি সৎভাবে সুপ্রার্থনা নিয়ে তাঁর কাছে যায় তবে তিনি অবশ্যই প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

মুখ থেকে কথা সরছিল না সঞ্জয়দা আর জয়ন্তদার। কিছুটা সংবরণ করে নিয়ে ওরা বললেন, ''আর তোমার গুরু মহারাজ !'' উত্তর দিলাম, ''বাউরিয়া স্টেশন আসছে এবার ট্রেন থেকে নামতে হবে বাকিটা না হয় পরেই বলব। শুধু এটুকু বলি, ''আমার গুরু মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল তারকনাথ চক্রবর্তী আর এর পিছনেও একটা ইতিহাস আছে।'' মজা হচ্ছিল ওদের কৌতূহলী চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে। যাই হোক পরবর্তীকালে ওনারা দুজনেই আমার গুরুমহারাজের কাছ থেকে সপরিবারে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন, এবং গুরুমহারাজের কৃপা এবং যোগ বিভূতির বহু নিদর্শন লাভ করেন।

—শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ চরণাশ্রিত
শ্রীঅরিন্দম মিত্র

আশ্রম সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী — শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের আসন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন ভোরবেলা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের পূজা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে আমাদের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আশ্রমের সদস্যবৃন্দ পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীরা

নৃত্যপরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীমা আশ্রমস্থ কয়েকজন সহ হোটর আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে যান। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা ও আরতির মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাধ্বী সুচেতানন্দময়ী ও সাধ্বী পুণ্যানন্দময়ী। আশ্রমের সন্ন্যাসিনী ও শিষ্যাগণও এক-এক করে শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিশেষে আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

৯ই ফেব্রুয়ারী — এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে সুপ্রসিদ্ধ

সঙ্গীতশিল্পী শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত শ্রুতিমধুর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

২রা মার্চ — এইদিন শ্রীশ্রীমা যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটিতে যান।

৪ঠা মার্চ — শিবরাত্রির মধ্য-রাত্রে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত পরমশিবের পূজা হয়।

২১শে মার্চ — দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আশ্রমে দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদিত হয়। সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠানের

শুরু হয় শিশু শিল্পী সমাদৃতা বসুর নৃত্যের মাধ্যমে তারপর পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের শিষ্যাবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত হয় বসন্ত উৎসবের মনোরম নৃত্য।

২৪শে মার্চ — আধ্যাত্মিক সভার ৩০ তম পর্বে 'কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গে' ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

১৩ই এপ্রিল — নবরাত্রির অষ্টমী তিথির সকালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মায়ের পূজা হয় অন্নপূর্ণা মন্দিরে। পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর উপস্থিত সকল শিশু ও ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

১৪ই এপ্রিল — এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে রামনবমী উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের অপূর্ব ভজন গানে সকলে বিমোহিত হয়।

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

বুদ্ধ পূর্ণিমা — ১৮ই মে, শনিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ৩০শে জুন, রবিবার
গুরু পূর্ণিমা — ১৬ই জুলাই, মঙ্গলবার

भगवान कृष्णद्वैपायन – व्यासदेव

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

ब्रह्मर्षि वशिष्ठदेव एवं अरुन्धती तनय शक्ति, महर्षि शक्ति एवं अदृश्यन्ती के पुत्र महर्षि पराशर के औरस से दासवंश की धीवर राजकन्या मत्स्यगंधा (सत्यवती) के गर्भ से कृष्णद्वैपायन ने जन्मग्रहण किया। उनका जन्म यमुना द्वीप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम 'द्वैपायन' एवं युगधर्म के पादक्षय एवं मनुष्यों की आयु एवं शक्ति का ह्रास देखकर वेद के स्थायीत्व एवं ब्राह्मणों हेतु आकुलता-प्रयुक्त पवित्र शास्त्रग्रंथ वेद को उन्होंने विभक्त किया था अतएव उनका एक अन्य नाम वेदव्यास या व्यासदेव भी था। उनका गात्र-वर्ण कृष्ण था इसीलिए वे कृष्णद्वैपायन के नाम से भी विख्यात थे। भगवान शंकर ने ऋषि पराशर की साधना से संतुष्ट होकर उन्हें योगश्रेष्ठ, जरा-मृत्यु रहित 'वेदव्यास' नामक पुत्र प्रदान किया। ये वेदव्यास श्रीकृष्णद्वैपायन ही हुए पुराणप्रसिद्ध एक अनन्य भगवत्लीला संगठक ऋषि। द्वापर युग में श्रीकृष्ण की लीला एवं महाभारत की लीला भगवान वेदव्यास की साधना का अचिन्त्य दिव्य प्रकाश है।

कृष्णद्वैपायन ने जन्मग्रहण करते ही शैशावावस्था से वर्धित होकर अपनी माता सत्यवती से कहा, ''मैं अभी तपस्या हेतु गमन करूँगा। आपको जब भी किसी विशेष कारणवश प्रयोजन उपस्थित होगा, तब मुझे स्मरण करते ही मैं तत्काल आप के पास उपस्थित हो जाऊँगा।'' माता को ऐसा सुदृढ़ आश्वासन दे कर वे प्रत्येक तीर्थ में स्नान कर परम तपानुष्ठान करने लगे। इस प्रकार बहुकाल अतिवाहित होने के बाद एक बार कलियुग के आगमन का अनुभव कर उन्होंने वेद-रूपी वृक्ष को शाखाओं द्वारा सजाया। शाखाओं द्वारा उन्होंने वेद का विस्तार किया था इसीलिए वे 'वेदव्यास' के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अष्टादश पुराण-संहिता एवं महाभारत महाकाव्य प्रणयन एवं वेद विभाग कर अपने शिष्य सुमंत, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित एवं देवल तथा निज पुत्र शुकदेव को इसका अध्ययन कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'ब्रह्मसूत्रम्' या 'वेदान्त दर्शनम्' का भी प्रणयन किया।

अग्निपुराण में वर्णित है, द्वापर युगान्त में श्रीहरि वेदव्यास के रूप में अवतरित होकर वेद-विभाग करेंगे। प्रारंभ में वेद चतुष्पाद एवं शत-सहस्र शाखा समन्वित एकमात्र यजुर्वेद था। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने उसे चार भागों में विभक्त किया। उसमें यजुः समूह में 'आध्वर्य्यव'; ऋक् समूह में 'होत्र', अथर्व समूह में 'ब्रह्मत्व' का विधान किया था। वेदव्यास के शिष्य पैल ऋग्वेद में पारदर्शी थे। वेदव्यास के अन्य शिष्य में वैशंपायन ने यजुर्वेद तरु की सप्तविंशति (२७) शाखा की कल्पना की। जैमिनी ने सामवेद तरुशाखा की कल्पना की एवं सुमंत ने अथर्व तरु का विभाग कर पैप्पलादि हजारों शिष्यों को अध्ययन कराया। और सुत (शुकदेव) ने व्यास की कृपा से पुराण-संहिता का प्रणयन किया। – श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासदेव महर्षि की ये समस्त सुवृहत् कार्यावली सनातन धर्म संरक्षणार्थ परिलक्षित हुई। भगवत् सत्ता के बिना यह महान कार्य संपादन करना संभव नहीं है; जो भगवत्-सत्ता हैं वे अवतारकल्प होते हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। मत्स्यपुराण एवं स्कंदपुराण के मतानुसार पराशरनंदन वेदव्यास को भगवान विष्णु के अष्टम अवतार के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। एवं विष्णु के नवम् बुद्धावतार में द्वैपायन पुरोधा थे।

पराशरनंदन वेदव्यास ने सनत्कुमार के निकट उपस्थित होकर यह पूछा, 'घोर कलियुग में क्या श्रेयस्कर है एवं किस प्रकार कर्म करने से संसार मुक्त हुआ जा सकता है।' प्रत्युत्तर में भगवान सनत्कुमार ने कहा कि वाराणसी में जाकर शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इससे यह बोधगम्य होता है कि व्यासदेव ने सनत्कुमार

से 'मोक्षयोग' प्राप्त किया था। अध्यात्म योगमार्ग पर वाराणसी का अधिष्ठान आज्ञाचक्र में है। योगी उस अवस्था में उपनीत होने पर स्फटिक स्वच्छ श्वेतशुभ्र नीलवर्णाभा समन्वित जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, वही हैं विश्वनाथ या विश्वेश्वर। आज्ञाचक्र के वाराणसी में विश्वनाथ-अन्नपूर्णा शक्ति सम्मिलित शिवलिंग दर्शन से योगी मोक्षमार्ग प्राप्त कर सहस्रार अभिमुख यात्रा करता है। पार्थिव वाराणसी का माहात्म्य भी योगियों के पक्ष में मोक्षस्वरूप कारण है क्योंकि भूलोक सप्तलोक के अन्तर्गत स्थूल प्रकृति का जगत् है जहाँ जीव का क्रमविवर्तन साधित होता है।

किसी एक समय वेदव्यास भिक्षोपजीवि तथा शिवाराधना में रत रहकर काशी में वास कर रहे थे। तब एक दिन भगवान शिव ने व्यास की परीक्षा के निमित्त पार्वती से कहा – ''आज कुछ ऐसी व्यवस्था करो, जिससे व्यास को काशी में कहीं भी भिक्षा ना मिले।'' शिव के कथनानुसार देवी पार्वती ने काशी के प्रत्येक गृहस्थ के भवन में जाकर व्यास को भिक्षा प्रदान करने के लिए मना किया। देवी के इस प्रकार निषेध करने के फलस्वरूप व्यासदेव के सशिष्य भिक्षाटन करने पर एक मुष्ठि भिक्षा भी नहीं मिली। दूसरे दिन भी भिक्षा ना मिलने पर व्यासदेव को कुछ सन्देह हुआ कि किसी ने शायद उन्हें भिक्षा देने के लिए गृहस्थों को निषेध कर दिया है। तब उन्होंने अपने शिष्यों को भिक्षा ना मिलने के संबंध में अनुसंधान करने के लिए कहा। वे लोग समस्त विषयों पर संधान के पश्चात् भी भिक्षाप्राप्त ना होने के कारण को समझ नहीं सके। परन्तु पर्यटन करते समय उन्होंने देखा कि प्रत्येक के आवास में धनधान्य की प्रचुरता है। इससे व्यासदेव ने अतिशय क्रुद्ध होकर अभिशाप दिया कि, ''काशीवासी चूँकि भिक्षा देने से विमुख हुए, उसी पाप से काशी में लब्धविद्याधन और मुक्ति आगामी तीन-पीढ़ियों पर्यन्त अप्राप्य रहेंगे।'' इसप्रकार अभिसम्पात कर व्यास क्षुधा की ज्वाला से पीड़ित होकर पुनराय भिक्षार्थ बाहर निकले। इस बार भी सम्पूर्ण दिन भ्रमण करने के उपरान्त भी कुछ भी नहीं पाया। अवशेष में सायंकाल में क्रोध से भिक्षाभांडों को दूर निक्षेप कर क्षुब्ध मन से जब अपने आवास की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे थे तभी पथ के मध्य देवी भगवती एक सामान्य गृहस्थ नारीरूप धारण कर एक भवन के द्वार पर दण्डायमान होकर व्यासदेव से अपने गृह में अतिथि होने के लिए अनुरोध करने लगी। देवी ने कहा कि उनके स्वामी प्रत्यह एक अतिथि को भोजन न करवाने पर्यन्त अन्नग्रहण नहीं करते। दुर्भाग्यवशत: उस दिन उनका किसी भी अतिथि के साथ साक्षात् नहीं हुआ। इसीलिए उनके स्वामी ने भी समस्त दिवस आहार नहीं लिया। इसीलिए देवी ने व्यास से विशेष अनुरोध कर कहा कि, व्यास यदि उनका आतिथ्य स्वीकार करे, तो उनके स्वामी भी उनका अतिथि सत्कार कर धन्य होंगे। व्यासदेव ने तब देवी से कहा कि, देवी यदि उनके दस सहस्र शिष्यों के लिए आहार की व्यवस्था कर सकेगी तभी वे उनके यहाँ अन्न ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। देवी ने इस शर्त पर सम्मत होकर सशिष्य व्यासदेव को अपने भवन में अन्नग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। तब व्यास शीघ्रातिशीघ्र समुदय शिष्यों को लेकर आहार के लिए उनके गृह में समवेत हुए। देवी ने भी उन सभी को परम परितोषपूर्वक आहार करवाया। आहारान्त व्यास जब सशिष्य प्रत्यावर्तन करने के लिए प्रस्तुत हुए तब देवी ने उन्हें कहा – ''आप अनुग्रहपूर्वक तीर्थवासियों हेतु धर्म का उपदेश दीजिए। मैं तदनुरूप कार्य कर यहाँ अवस्थान करूँगी।'' तब व्यास ने देवी से प्रथम में पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया। देवी इससे सन्तुष्ट नहीं हुई और उनसे साधारण धर्म का उपदेश देने के लिए कहा। तब व्यास ने कहा कि कर्कश वाक्यों से लोगों के मन में कष्ट का ना देना, दूसरे की उन्नति से ईर्षा, द्वेष प्रकटित ना करना, विवेचना सहित कार्य करना एवं अपने भवन के मंगल की चिन्ता करना, यही साधारण धर्म है। तब देवी ने व्यासदेव से जिज्ञासा किया, ''इन समस्त धर्मों में से कौन, कौन से धर्म आप में हैं?'' व्यास उनका कोई उत्तर ना देने के कारण निरुत्तर रहे। तब शिव ने परिहासच्छल से कहा, ''मुझे लगता है ये गुण तुम में ही है एवं तुम्हीं परमधार्मिक हो किन्तु जिज्ञासा करता हूँ, किसी के मन का अभिप्राय सिद्ध ना होने पर वह व्यक्ति यदि क्रुद्ध होकर शाप प्रदान करता है, तो उसके लिए कौन पाप भागी होगा?'' व्यास ने उत्तर दिया कि, ''वह पाप विवेचनाहीन शापदाता को ही होता है। तब शिव ने स्वमूर्ति धारण कर कहा, ''तुमने अपने प्रारब्धवशत: भिक्षालाभ से वंचित होकर निरपराध काशीवासियों को अभिशाप दिया।

इसलिए तुम इस स्थान में वास नहीं कर पाओगे।''

शिव द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर व्यासदेव ने अपनी मूर्खता अनुभव की एवं शिव पार्वती के निकट क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने विधान दिया कि मात्र प्रति अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को वे काशीधाम में प्रवेश कर सकेंगे। परवर्तीकाल में कठोर तपस्याव्रती होकर व्यासदेव ने शिव के असीम अनुग्रह को प्राप्त किया। उसके पश्चात् से वे स्वेच्छानुयायी वाराणसी - काशी में आना जाना करने लगे। इस भगवत्लीला में भगवान ने सभी को सजाग कर दिया कि ईश्वर-कोटि की सत्ता होने के बावजूद भी माया-मल कब किसे आवरित कर भ्रम में पतित कर देते हैं उसके संबंध में कोई बोल नहीं सकता। भगवान विष्णु के साक्षात् अवतार होने के उपरान्त भी व्यासदेव को सुदीर्घकाल तक तपस्या करनी पड़ी थी एवं तपोरत अवस्था में उन्हें कभी-कभी हमलोग नित्य सिद्धासन से च्यूत होते हुए देखते हैं; जैसे, व्यासकाशी सृष्टि की घटनावली। भगवत्सत्ता का समग्र जीवन ही सत्शिक्षा से पूर्ण रहता है। इसीलिए महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास से हमलोग सत्शिक्षा ही ग्रहण करेंगे। जो लोकशिक्षा देने के लिए अवतरण करते है, वे ही हुए सद्गुरु एवं व्यासदेव हैं भगवत्लीला संघटक अनन्य ऋषि इसीलिए जगद्गुरु विश्वगुरु कहकर आज भी पूजित होते हैं। उनका जन्मदिन श्रीश्रीगुरुपूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।

महामुनि व्यासदेव ने दारपरिग्रह करने के इच्छुक होकर महर्षि जाबालि की कन्या वटिका के साथ पाणिग्रहण किया। वटिका के गर्भ से शुकदेव का जन्म हुआ। पुत्र शुकदेव द्वारा जिज्ञासित होने पर व्यासदेव ने कर्मप्रभाव से लोगों के किस प्रकार की गति प्राप्त होती है एवं ज्ञानबल से किस प्रकार की गति प्राप्ति होती है, इस विषय पर विस्तारित व्याख्या की। इसके अतिरिक्त व्यासदेव ने शुकदेव को बहुविध विषयों पर ज्ञानगर्भित उपदेश प्रदान किए। ये समस्त है महाभारत का शान्तिपर्व, अनुशासन पर्व, स्वर्गारोहण पर्व में। वेदव्यास मथुरावास काल में कृष्णगंगातीर्थ में स्नान और तपस्या करते थे। गोमती गंगा तीरस्थ नैमिषारण्य में व्यासदेव ने अपना आसन स्थापित कर वेद का विभाग किया। सरस्वती नदी के तीर पर व्यासाश्रम में देवर्षि नारद के आविर्भाव होने पर व्यासदेव के अनुरोध पर नारद ने उन्हें अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाकर भक्तियोग और प्रेमयोग के माहात्म्य का उपदेश दिया।

महर्षि कृष्णद्वैपायन को जब अपने विशाल महाभारत महाकाव्य को लिपिबद्ध करने के लिए जब कोई नहीं मिला तब उन्होंने ब्रह्मा के निकट जाकर अपने दु:ख को व्यक्त किया। इस पर ब्रह्मा ने उन्हें गणेश को स्मरण करने के लिए कहा। ब्रह्मा से निर्देश प्राप्त कर व्यास द्वारा गणपति गणेश का स्मरण करते ही गणेश व्यास के तपोवन में आविर्भूत हुए। तब व्यास ने विघ्नहर्ता गणेश को अपने द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। गणेश ने सम्मत होकर कहा, ''ठीक है, वैसा ही होगा। तुम्हारे काव्य को लिपिबद्ध करने का दायित्व लेता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जब लिखने लगूँगा तो मेरी लेखनी किसी प्रकार भी रुके नहीं।'' व्यासदेव ने देखा यह तो विकट समस्या है। इतनी विशाल रचना क्या बिना सोचे विचारे एक ही नि:श्वास में बोलना सम्भव है? लिपिकार भी अन्य कोई नहीं, स्वयं गणेश। वे तूफान की गति से लिपिबद्ध करते हैं। इसलिए व्यासदेव ने खूब सोच-विचार कर कहा, ''ठीक है, मैंने आपकी शर्त स्वीकार की। किन्तु मेरी भी एक शर्त है। मैं जो बोलूँगा वह आप बिना समझे लिपिबद्ध नहीं कर सकते।'' गणेश सम्मत हुए। शुभारम्भ हुआ महाकाव्य महाभारत का। व्यासदेव बीच-बीच में गणेश को अत्यंत कठिन, गूढ़ अर्थवाला एक श्लोक बोल देते, जिसे लिखने के पूर्व गणेश को भी विचार विमर्श के लिए लेखनी को अल्प समय के लिए विराम देना पड़ता। उसी अवसर पर व्यासदेव मन ही मन में अनेक श्लोकों की रचना कर लेते। इस प्रकार महाभारत रचना यथासमय सुसम्पन्न हुई।

सर्वभूतों के हितार्थ वेदव्यास ने करुणावशत: महाभारत की रचना की। (महाभारत का अन्तर्निहित अर्थ योगतत्त्व का सार है)। परन्तु विभिन्न प्रकार से सर्वभूतों के मंगलार्थ चेष्टा करने के पश्चात् भी महान बादरायण (वेदव्यास हिमालय के बदरि वृक्ष परिवृत सरस्वती नदी के तीर पर निर्जन गिरिगुहा में बहुकाल तक तपस्यारत थे। इसी लिए उनका अन्य नाम बादरायण था।) भी अन्तर में तृप्तिलाभ नहीं कर पाए थे। इसीलिए अप्रसन्नचित्त सरस्वती नदी के तीर पर निर्जन में बैठकर अपने मन से अनेक वितर्क कर अवशेष में उन्होंने अनेक कठोर तप अवलम्बन कर ब्रह्मचर्य का पालन कर गुरुओं और अग्निदेव की आराधना की। इसके अतिरिक्त

अष्टादश पुराण तथा महाभारत रचना करने के बाद भी उनके अन्तर में तृप्तिबोध नहीं हो रहा। उन्होंने बोध किया इतना कुछ करने के बाद भी उनकी अन्तरात्मा तो ब्रह्मतेज से उद्भासित नहीं हो रही! निज को आत्मस्थ बोध नहीं कर पा रहे। तब क्या परमहंसों के प्रिय अच्यूतदेवों के भी प्रिय भागवत धर्म की कथा अपर्याप्त ढंग से तो नहीं बोली गई? उसी कारण हृदय मध्य कहीं जैसे एक शून्यता विराज कर रही है। इस प्रकार अपने को अपूर्ण मान कर जब वे दुखी हो रहे थे तब कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती स्थान में सरस्वती नदी के तट पर बदरि वृक्ष से परिवेष्टित व्यासाश्रम में देवर्षि नारद आकर उपस्थित हुए। ब्रह्मानन्दन नारद को यथाविहित अभ्यर्थना करने के पश्चात् नारद ने व्यासदेव से कहा, ''पराशर नन्दन, आपकी काया, मन सब ठीक तो है? आपने जो वृहत् अत्यद्भूत महाभारत की रचना की है उसे सर्वार्थसार कहा जा सकता है, इसके अतिरिक्त आपने सनातन ब्रह्म का विचार कर उसे प्राप्त भी किया है। तथापि आप स्वयं को अपूर्ण मानकर शोक क्यों कर रहे हैं? तब व्यासदेव ने कहा, ''आपने जो-जो कहा वे समस्त ठीक है, किन्तु उसके पश्चात् भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही। इसका कारण क्या है?'' व्यासदेव की बात सुनकर नारद ने कहा, ''अपने स्वरचित ग्रंथों में श्रीभगवान के अमल यश की कथा का गुणगान नहीं किया है। सिर्फ धर्म के ज्ञान से श्रीभगवान सन्तुष्ट नहीं होते, और जिस ज्ञान से वे तुष्ट नहीं होते, मुझे लगता है वह ज्ञान व्यर्थ है। मुनिश्रेष्ठ आपने जिस प्रकार धर्म या अनुष्ठानों का कीर्तन किया है उस प्रकार से वासुदेव की महिमा की वर्णना नहीं की है। राजहंस जैसे सिर्फ मानस सरोवर में ही विहार करते है, परमहंसगण भी वैसे ही हरिपादपद्म में ही परमानन्द में मग्न रहते है। जिस ग्रंथ में अनन्तकीर्ति भगवान की यशकथा कीर्तित होती है, वह अपभाषा में रचित होने पर भी उसके वाक्य सज्जन सुनते हैं, भजन करते हैं एवं अन्तर में धारण करते हैं। वह ग्रंथ ही मनुष्य के पापनाश में समर्थ है। अतएव आप भगवत्लीला का प्रचार करिए। भगवान की कीर्ति कथा सुनने पर मुमुक्षुओं की ज्ञान-पिपासा तृप्त होगी। भगवान का नाम सुनने में ही सभी को अच्छा लगता है। उनकी चरणसेवा ही तीर्थ-सेवा है। उन्हीं भगवान का नाम जब मेरी इस वीणा के तारों में झंकृत होता है, उनकी वीर्यवान कीर्तिकथा का गीत के सुरों में जब जयघोष होता है तभी मानों करुण प्रार्थना भरी प्राणों की आवाज से वे मेरे चित्ताकाश में उद्भासित हो उठते हैं। विषय भोग वासना के आक्रमण से अवसन्नचित्त संसारियों हेतु हरिभजन ही संसार-रूपी सागर को पार करने की एक मात्र तरणी है। अतएव हरिसेवा ही एकमात्र शान्ति का पथ है।'' इस प्रकार समस्त उपदेश प्रदान कर देवर्षि ने वहाँ से प्रस्थान किया।

इसके पश्चात् ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तीर पर बदरि वृक्ष समाकीर्ण ऋषियों के 'सम्याप्रास' नामक आश्रम में व्यासदेव आचमन सम्पन्न कर एकाग्रमन से ध्यान में बैठे। शुद्ध भक्तियोग हेतु जब उनका मन निर्मल हुआ तो उन्होंने आदिपुरुष भगवान को एवं उनके अधीन माया का दर्शन किया। भक्तियोग का पथ अनुसरण करने पर, भगवद्दर्शन होने पर संसार के समस्त अमंगल शीघ्र ही दूर हो जाते हैं क्योंकि भगवान से ही इन्द्रियज ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसारी विषयी लोग मूढ़ होते हैं एवं वे लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए साधारण लोगों के मंगल के निमित्त व्यासदेव ने तब 'भागवत् संहिता' की रचना की।

स्वानुभूति के आलोक से :- महर्षि कृष्णद्वैपायन कृष्ण-सायुज्यप्राप्त एक साक्षात् श्रीकृष्णरूप व्यक्तित्व थे। ये ऋषिकल्प महामानव कलयुग में अवतीर्ण हुए थे, उनके संबंध में हमलोग जान सकते हैं ड: गोपीनाथ कविराज रचित 'कलि में ऐश्वरिक लीला' एवं श्रीअमरेन्द्र श्याम रचित 'वृहत् किशोरी भागवत' ग्रंथ में , भगवान किशोरी मोहन या किशोरी बाबा रूप में । मेरे तपोपूर्ण जीवन में भगवान किशोरी मोहन ने मुझे अपना आत्म-परिचय 'कृष्णद्वैपायन' ऋषि के रूप में प्रदान कर कलि में ईश्वरीय लीला माधुर्य की तत्त्वगत विशिष्टता क्या है, वह व्यक्त किया था। इनकी ही अनुकम्पा से मेरा तपोलब्ध जीवन भक्तियोग के निगूढ़ अवस्था में उपनीत होने में सहायक हुआ। भगवान किशोरी मोहन कहते थे –''मेरी यह देह पूर्ण का आधार है।'' श्रीभगवान की भक्त शिष्यों के साथ लीला भी थी श्रीकृष्ण लीला के अनुरूप। उन अवतार-कल्प महान महर्षि को भक्ति विनम्र प्रणाम निवेदन करती हूँ।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

– हरि ॐ – कृष्ण ॐ –

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(२२)

यावद्देहान्तकालोहस्ति तावद्देवि गुरुं स्मरेत्।
गुरुलोपो न वक्तव्यः स्वच्छंदं यदि भावयेत्।। ६९

हे देवि, यावत् देहान्तकालः अस्ति, तावत् गुरुं स्मरेत् यदि स्वच्छंदं भावयेत् (तहि) गुरुलोपः न वक्तव्यः।।६९

हे देवि, जिस पर्यन्त देह का अन्त न होता है, उस पर्यन्त गुरु स्मरण करोगे। यदि निज मंगल चाहते हो, तो गुरुलोप की बात न कहो।।६९

यह कहने का तात्पर्य यही है कि जितने क्षण शरीर रहता है, उतने क्षण शरीर के मध्य मन भी है; इस मन के ऊर्ध्वगति

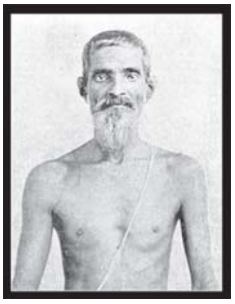

से मन का लय गुरु में होता है, एवं अधोगति से जगत् में लय होता है। जगत् और गुरु के अंश लेकर मन की उत्पत्ति हुई है; इस मन के जगत् में लय होने पर जीव की नरक में गति होती है एवं गुरु में लय होने पर, उससे उद्धार होकर वह स्वच्छंदभाव प्राप्त करता है तब जीव मृत्यु को अतिक्रम करके अमृतत्त्व लाभ करता है। (ईशोपनिषद् ११ वाँ श्लोक देखो)। गुरु के मध्य विषयमल नहीं होता है इसलिए वे स्वच्छ हैं एवं उनमें मिश्रित हो जाने से ही स्वच्छंदता लाभ होती है। 'स्व' अर्थ से आत्मा एवं 'छंद' अर्थ से इच्छा, गुरु आत्मस्वरूप हैं इसलिए उसमें मिल जाने की इच्छा होने से, जगत् की इच्छा का नाश होकर स्वच्छंदता अथवा स्वाधीनता एवं अमृतत्त्वलाभ होता है। जगत् परकीय वस्तु है, परकीय वस्तु में मिल जाने की इच्छा होने से यंत्रणासह जगत् में गति होकर जीव मृत्यु के वश में चला जाता है।

गुरुरग्रे न वक्तव्यमसत्यंच कदाचन।।७०
गुरोः अग्रे कदाचन असत्यंच न वक्तव्यम्।।७०
सत्यस्वरूप गुरु समीप में कदापि असत्य न कहना।।७०

कहने का तात्पर्य यह है कि सुक्ष्म मन सर्वप्रथम बात करता है, पश्चात् में जड़ वाक्य के द्वारा वह प्रकाशित होता है, इस कारण प्रकृतपक्ष में मुख बात नहीं करता परन्तु मन ही बात करता है। सत्य स्वरूप गुरु को लक्ष्य करके जब साधन कार्य होता है, तब सत्य वाक्य ही उनके समीप कहना चाहिए, अर्थात् असत्य जागतिक सम्पत्ति लक्ष्य करते हुए साधन कार्य होने से गुरुदत्त साधन नहीं होता बल्कि सम्पत्ति का ही साधन होता हैं यथा – अर्थलाभ के लिए 'धनं देहि' कहकर, मानलाभ के लिए 'मानं देहि' कहकर, अथवा विपत्ति उद्धार के लिए 'त्राहि मां' कहकर साधन इत्यादि। जागतिक चिन्तायुक्त होकर साधन होने से मन के विषयांतर में गति होकर गुरुब्रह्म की साधना नहीं होती, गुरुध्यान में रहकर साधन करने पर ही गुरु –साधना होती है।

यो वै हुं कृत्य हुं कृत्य गुरुं वर्ज्जित्य वादतः।
अरण्ये निर्ज्जने स्थाने स भवेत् ब्रह्मराक्षसः।।७१

यः (पुरुषः) वै अरण्ये (अथवा) निर्ज्जने (जनशून्य में) स्थान में (स्थितोहपि) हुं कृत्य हुं कृत्य वादतः (तर्केन) गुरुं निर्ज्जित्य (प्रवर्तते) सः ब्रह्मराक्षसः भवेत्।।७१

जो जन अहंकारवश सदर्प सह निज को श्रेष्ठ समझते हुए एवं गुरु को हीन भाव में देखकर उनसे बातचीत करता है, यथा – देह के मध्य प्राण की सृष्टि कर सकता हूँ , इत्यादि (गीता १६ वाँ अः १४, १५ श्लोक देखो), उस व्यक्ति द्वारा अरण्य में अथवा अन्य निर्जन स्थान में साधन करते हुए भी उसके मन के भीतर बहुचिन्ता रहने से उसका जनाकीर्ण स्थान में साधन हो रहा है समझना होगा एवं तद्रूप साधन मध्य ब्रह्म को आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा है, परन्तु ब्रह्म को आत्म-उदरस्त करते हुए राक्षसवत् व्यवहार कर रहा है।

मन चिन्ताशून्य होने पर ही साधन का स्थान भी जनशून्य होता है एवं अनेक लोगों के मध्य रहकर भी किसी के प्रति लक्ष्य न रहने पर, कई जनोंके रहते हुए भी कोई नहीं है, ऐसा समझना होगा, कारण मनोरूपी जीव उस स्थल पर किसी का संग नहीं कर रहा है, एवं शरीर जनशून्य अथवा जनाकीर्ण स्थान में रहने से भी जीव की कोई क्षति वृद्धि नहीं होती, कारण जड़ देह में बोधशक्ति नहीं है। *...क्रमशः*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्रीअमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (९) शिष्य के प्रति तत्त्वोपदेश–

गतांक से आगे...

श्रुति में जीव देह को ब्रह्मपुर कहा गया है। यथा – यदिदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म-दहरो अंतराकाश.. इत्यादि।

जीवदेह ब्रह्म का वासस्थान है इसीलिए इसे ब्रह्मपुर कहा गया है। हृदयपद्म में बुद्धि के साथ ब्रह्म क्षुद्रस्थान में व्याप्त होकर अवस्थित हैं इसीलिए उन्हें दहराकाश, प्रत्यक चैतन्य, साक्षी चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, क्षेत्रज्ञ पुरुष इत्यादि कहा गया है। यहाँ दहर, प्रत्यक शब्द का अर्थ है क्षुद्र। वे क्षुद्र आकार में नहीं हैं। ये सर्वापेक्षा व्यापक है अतएव उन्हें 'दहर प्रत्यक' कहा गया है।

वेदान्द-दर्शन में श्रुति के दहराकाश जो ब्रह्म हैं, वे जीव नहीं हैं यह 'दहर उत्तरेभ्य' इस सूत्र में उक्त है।

यहाँ आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, सृष्ट आकाश नहीं। वही चैतन्य सदृश आभास या प्रतिबिंब बुद्धि के साथ युक्त है, उसे आभास चैतन्य, चित्प्रतिबिंब, चिदाभास इत्यादि कहते हैं। वही चित् प्रतिबिंब बुद्धि के साथ युक्त होकर अचेतन जड़-बुद्धि को मानों सचेतन या क्रियाशालिनी बनाती है। उसके द्वारा अचेतन बुद्धि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होकर वैसे आकार में आकार ग्रहण करती है। परंतु उनसे वास्तविक ज्ञान नहीं होता। बुद्धि कभी भी द्रष्टा नहीं होती। उपर्युक्त क्षेत्रज्ञ पुरुष बुद्धि की वृत्ति का दर्शन करते हैं, तभी वस्तुज्ञान होता है (बुद्धि आभास चैतन्य के साथ युक्त होकर भी द्रष्टा ज्ञाता नहीं हो सकती। उसके द्वारा केवल वृत्तिशालिनी होती है।) क्षेत्रज्ञ पुरुष सदैव बुद्धि वृत्ति का दर्शन करते हैं तब ज्ञान उत्पत्ति होती है। उक्त चित्प्रतिबिंब बुद्धि के साथ युक्त होकर ही व्यावहारिक जीव के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रज्ञ पुरुष ही है परमार्थिक जीव। चित्प्रतिबिंब नाम का जीव है। प्रधान जीव है क्षेत्रज्ञ पुरुष। क्षेत्रज्ञ पुरुष सदा ही बुद्धिवृत्ति के द्रष्टा हैं। वे वृत्तिशून्या बुद्धि का दर्शन नहीं करते। जब साधन द्वारा बुद्धि वृत्तिशून्य होती है, तब क्षेत्रज्ञ पुरुष स्वरूप में अवस्थान करते हैं। उसी समय जीव को आत्मदर्शन होता है। और जब वृत्ति रहती है तब वृत्ति के साथ युक्त होकर वैसी तदाकारत्व प्राप्त करती है। किन्तु त्रिगुणात्मिका बुद्धि का परिणाम, परिवर्तन, रूपान्तरता घटित होता है। और चैतन्यरूप क्षेत्रज्ञ पुरुष में ये सब घटित नहीं होते। वे सदैव एकरूप है। क्षेत्रज्ञ पुरुष द्वारा बुद्धिवृत्ति का दर्शन नहीं करने पर जीव को किसी भी विषय का ज्ञान रहता ही नहीं।

ज्ञान नहीं रहने पर देह इन्द्रिय, मन, बुद्धि ये सारे जड़वत् रहते। इसीलिए वे पारमार्थिक जीव है। संकल्प से ब्रह्म ने जीवाकार धारण किया। अज्ञान से युक्त होने के कारण जीव यह जान नहीं पाता कि ब्रह्म ही उस की आत्मा हैं। ब्रह्म चैतन्य सर्वत्र परिव्याप्त – जड़ एवं जीवदेह के भीतर भी अवस्थित हैं। जीव देह में नखशिख ब्रह्मचैतन्य वर्तमान हैं। चैतन्यरूपी क्षेत्रज्ञ पुरुष ब्रह्म चैतन्य से अलग नहीं है। यह ब्रह्म चैतन्य प्रत्येक देह के भीतर मानों भिन्न भिन्न क्षेत्रज्ञ पुरुष के रूप में अवस्थित है। वे बुद्धिवृत्ति के द्रष्टा हैं इसीलिए उन्हें क्षेत्रज्ञ पुरुष कहते हैं। भगवद्गीता के त्रयोदश अध्याय में उक्त है कि एक अद्वितीय सर्वव्यापक ब्रह्मचैतन्य ही प्रत्येक जीव देह में स्वतंत्र क्षेत्रज्ञ पुरुष के रूप में निवास करते है। अखण्ड चैतन्य मानों विभक्तरूप में दिखते है, परन्तु वे अविभाज्य है, 'क्षेत्रज्ञंचापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत।' यहाँ 'मां' शब्द का अर्थ है – 'मुझे' अर्थात् परमात्मा को। उस समस्त अध्याय का पाठ करने पर समझ पाओगे। स्थूल देह, मन, बुद्धि इन्द्रियादि समन्वित आभास चैतन्य एवं क्षेत्रज्ञ पुरुष ये समस्त मिलकर ही हुआ जीव। क्षेत्रज्ञ पुरुष ही जीव के सुख दु:खादि के भोग का हेतु है। इसीलिए उसे भोक्ता कहते हैं। किन्तु केवल क्षेत्रज्ञ पुरुष से भोग नहीं होता, एवं क्षेत्रज्ञ पुरुष रहित मन, बुद्धि इन्द्रियादि स्थूलदेह युक्त आभास चैतन्य से भी भोग नहीं होता। आभास-चैतन्य एवं क्षेत्रज्ञ पुरुष ये उभय होने पर ही भोग होता है। जीव, बुद्धि एवं इन्द्रियादि तथा स्थूलदेह युक्त होने पर भी, अविद्या या अज्ञानवश अपने परमार्थिक स्वरूप

चैतन्य से अवगत नहीं है, जीव का स्वरूप ब्रह्म है ऐसा श्रुति में कथित है। श्वेतकेतु के पिता ने श्वेतकेतु को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते समय कहा 'सोहम्' – वह ब्रह्म मैं ही हूँ। 'तत्त्वमसि' – तत्-त्वम्-असि। वही ब्रह्म तुम हो। तत् शब्द का अर्थ – परिव्याप्त समष्टि ब्रह्म- चैतन्य एवं त्वम् शब्द का अर्थ – देहगत व्यष्टि- चैतन्य। ये उभय ही एक चैतन्य है यही उक्त है। साधन द्वारा ज्ञानोदय होने पर 'मैं ही ब्रह्म', एतत् समस्त ही ब्रह्म, इस प्रकार वे ब्रह्म को जान पाते हैं। ब्रह्म को जानना ही जीव का ज्ञान है। ब्रह्म को न जानना ही अज्ञान या बंधन है। ज्ञानोदय होने पर फिर पुर्नजन्म नहीं होता, किसी लोक में भी गति नहीं होती। उत्तरगीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है – 'नाहं ब्रह्मेति जानाति, तस्य मुक्तिर्न विद्यते'। इसका अर्थ है – जो अपने को ब्रह्म के रूप में नहीं जानते उनकी मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार की उक्ति प्राय: प्रत्येक श्रुति में एवं सभी शास्त्रों में है। ब्रह्मज्ञान अति स्वाभाविक। बुद्धि विशुद्ध सत्त्व गुणात्मिका, उसका रज और तम मलयुक्त होकर मलिन हो गये हैं। साधन द्वारा बुद्दि से रजस्तम मल अपगत होने पर स्वयं ही ब्रह्मभाव का विकाश होता है। तब जीव समझ पाते हैं कि बुद्धि से वे स्वतंत्र हैं।

...क्रमश:

–हिन्दी अनुवाद: मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

भगवत् कथा

शिप्रा जन्मकथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

एकदा महेश्वर ब्रह्मा का कपाल लेकर सर्वलोक में विचरण करने लगे। सर्वलोकों में कहीं भी भिक्षा ना मिलने पर अवशेष में वे वैकुन्ठ में उपस्थित हुए। वहाँ भगवान विष्णु से भिक्षा चाहने पर तब विष्णु ने उनसे परिहास करते हुए, ''ये देखो, मैं तुम्हें भिक्षा दे रहा हूँ'' बोलकर उनके ललाट पर तर्जनी से स्पर्श किया। इससे अतिशय क्रोधित होकर शंकर ने विष्णु की उस अंगुली का छेदन कर दिया। उस छिन्न अंगुली से निर्गत रक्तधारा ने महादेव के हस्तधृत उस ब्रह्मा कपाल को पूर्ण कर दिया एवं पश्चात् में पात्रोच्छलित रक्तधारा भूतल में प्रवाहित हुई जिससे 'शिप्रा' नाम की एक महानदी की सृष्टि हुई।

इसके पश्चात् किसी समय क्षुधार्त महादेव कपाल को हाथ में लेकर भिक्षा हेतु पाताल लोक में भोगवती नदी के तट पर उपस्थित हुए। वहाँ वे घर-घर में भिक्षाटन करने लगे। किन्तु किसीने उन्हें भिक्षा प्रदान नहीं की। तब क्षुधार्त होकर महेश्वर ने नागलोक में रक्षित एकविंश (२१) कुण्डस्थित समुदय अमृत का पान कर लिया। नागगण ने यह जानकर द्रुतगति से नागराज वासुकी को संबाद प्रेरण किया। वासुकी ने तब विष्णुलोक में गमनकर भगवान विष्णु से समस्त घटना निवेदन की, तब एक आकाशवाणी हुई –''हे नागगण, तुम लोगों ने क्षुधार्त देवता को आहार प्रदान नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अमृत कुण्डस्थित समुदय अमृत का पान कर लिया। तुमलोग यदि अपने अमृत को पुन: प्राप्त करने की वांछना करते हो, तो महाकाल वन में जाकर शिप्रा नदी में स्नान कर महेश्वर की आराधना करो। उससे देवादिदेव सन्तुष्ट होकर तुम्हारे सुधा को सम्पूर्णतया पूर्ण कर देंगे।'' अंततोगत्वा नागगणों द्वारा इस दैववाणी अनुयायी कार्य करने पर उन्हें सुधा भण्डार पुन: प्राप्त हुआ।

स्कन्द पुराण में कथित है कि समुद्र मंथन से निसृत कालकूट के तेज से जब देवता और असुरगण अतिष्ठ हो उठे, तब उनकी कातर प्रार्थना से द्रवित होकर महादेव ने इस समस्त कालकूट को अपने कन्ठ में धारण किया। यह देखकर देवी शिवानी ने भयभीत होकर शंकर का संग परित्याग किया। भूतनाथ ने इससे अत्यंत दु:खित होकर गंगा से कहा, ''तुम इस भयंकर विष को तरंग के साथ सागर में ले जाओ।'' गंगा ने उस पर असम्मति प्रकट की तब महादेव ने शिप्रा नदी से अनुरोध किया। शिप्रा महादेव के अनुरोध पर इस विष को वरन कर महाकाल वन में ले गई। शिप्रा नदी ब्रह्मा की परमा कला है। शिप्रा नदी अग्निदेव की अन्यतमा पत्नी थी। वामन पुराण में वर्णित है, स्कन्द देवसेनापति पद पर वृत होने पर शिप्रा नदी उनके सहायतार्थ अपने अनुचर चित्ररथ को प्रेरण करती है।

(सहायक ग्रन्थ : स्कन्द पुराण, वामन पुराण)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ वें पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

९। **पत्र (१०) - (द्वितीय भाग)** साधारण योगीगण अर्थात् कृपायुक्त योगीगण १०८ में स्थिति लाभ करते हैं। यही है अनन्त। इसे भेदन न कर पाने पर अनन्त के अन्त से १०९ में प्रवेश अर्थात् एक के मध्य अनन्त समाविष्ट करना संभव नहीं होता। –(इस विषय पर माँ का मंतव्य)।

यदि गुरु पार्थिव शरीर में नहीं हैं तो कोई व्यक्ति उनके पास दीक्षा ग्रहण कर बीज प्राप्त कर निमित्त रूप में उपयुक्त आधार हो सकता है। उसका शरीर तथा गुरु-काया अभेद हो जाती है। इस प्रकार प्रतिनिधि 'निमित्त' मात्र होते हैं। इसका पारिभाषिक नाम 'आधा' है। इस आधा में गुरु की अनन्त शक्ति निहित होती है। स्थूल-काया युक्त 'आधा' को इस प्रकार गुरुभार वहन योग्य बनने हेतु अति कठोर तपश्चर्या से गुजरना पड़ता है। (वर्तमान काल में ऐसे आधार युक्त महात्मा कौन हैं और कहाँ हैं?)

उत्तर – (पत्रावली १० का द्वितीय भाग) –सर्वप्रथम यह जानना होगा कि कृपायुक्त योगमार्ग विषय क्या है? कृपायुक्त योग में जब योगी दीक्षाप्राप्त करते हैं तब सद्गुरु सर्वप्रथम उसके देहाभ्यंतरस्थ ४९ अणुसमूहों को (अर्थात् ४९ अणु या ४९ वायु केंन्द्र जो ललना-चक्र के नाम से ज्ञात है, हमारे तालुकुहर के केन्द्र में जिसका अवस्थान है) आकर्षित करते है एवं आकर्षण करते हुए उसमें निज चिन्मय काया को मिला लेते हैं। फलस्वरूप योगीदेह के समस्त परमाणु अणुहीन होकर क्षण-मात्र हेतु वर्तमान रहते हैं। इस अवस्था में परमाणु का अस्तित्व रहता है और उसका आश्रयरूपी मृतपिण्ड अर्थात् स्थूल देह, जिसे 'physical coat' (वाह्यिक आवरण) कहते हैं वह भी रहता है। यह स्थूल वस्त्र रूपी देह उस समय जड़वत् या शववत् अवस्थान करता है। तत्पश्चात् सद्गुरु अपने निज काया में से तदंशभूत शुद्ध काया उस परमाणु में संयुक्त करते हैं। ऐसा होने पर परवर्ती योगी की काया चिन्मय होकर शुद्ध देह में परिणत होती है। यह शुद्ध देह विशुद्ध चैतन्यमय स्वरूप है, जो सद्गुरु दीक्षा द्वारा शिष्य को प्राप्त होती है। सद्गुरु दीक्षा शुद्ध तेजोमय आकार स्वरूप होती है। दीक्षा काल में शिष्य निर्विकार भाव में इसका दर्शन करने में सक्षम होता है – कूटस्थ के गगनमंडल में मानों कोटि सूर्य की स्निग्ध तेजोदीप्त स्वर्णिम ज्योति का आविर्भाव – इसे ही कहते हैं जाग्रत कुंडलिनी। ये चैतन्यस्वरूप हैं, इसे ही 'गुरुशक्ति' कहते हैं। योगमार्ग में दीक्षित शिष्य के मध्य यह गुरुशक्ति कर्म संपादित करती है। यही शिष्य के प्रति सद्गुरु का अनुग्रह या कृपा। साधना करते-करते एक समय शिष्य–आधार में यह गुरुशक्ति पुष्टिलाभ कर पूर्णत्व दान करती है। यथार्थ रूप में यही है साधक योगी का इष्ट एवं चरमावस्था में यही हैं स्वयं महामाया दुर्गाशक्ति, महाशक्ति जो सत्ता की दुर्गति का नाश करती है - हृदय-पद्म की कर्णिका पर इस महाशक्ति का विकास होता है। यही है १०७। इस अवस्था में योगी-बोध महाज्ञान भेद कर इस महामायारूपी चित्प्रकृति का सारूप्य लाभ करता है। तत्पश्चात् १०८ - में प्रकृति को लाँघकर (पार कर) अनन्त बोध के पुरुषोत्तम अवस्था में योगी का बोध उपनीत होता है। इसके बाद जब योगी की हृदय ग्रंथि समग्ररूपेण भेद हो जाती है तब अद्वैत स्थिति में उपनीत होकर भी योगी अनन्त को निज अस्तित्व बोध के मध्य धारण करने में सक्षम होते हैं। यही है योगी का १०९ - में प्रवेश अर्थात् एक के मध्य अनंत को समाविष्ट करना। इसीलिए श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीभगवान ने कहा हैं – ''ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेहर्जुन तिष्ठति।''

गुरु के स्थूल देह में वर्तमान नहीं होने की अवस्था में कोई-कोई व्यक्ति गुरु के सूक्ष्म या कारण ज्योतिर्मय चिन्मय देह द्वारा दीक्षित होकर बीज प्राप्त करते हैं एवं तब वह व्यक्ति 'निमित्त' रूप में गुरुरूपी गुरुशक्ति का आधार बन

सकता है। यह 'निमित्त' देह सद्गुरु का प्रतिनिधि मात्र है। इसी का पारिभाषिक नाम 'आधा'। इसी 'आधा' में ही गुरु की अनन्त शक्ति निहित होती है। स्थूल देह युक्त 'आधा' को गुरुभार वहन के योग्य बनाने हेतु अति कठोर तपश्चर्या से गुजरना पड़ता है, वस्तुतः गुरु ही 'आधा' देह को पूर्णत्व की ओर अग्रसर करा देते है। उसकी काया गुरु की काया से अभिन्न होती है। समस्त महात्मागण जो अपने गुरु द्वारा गुरुपद पर अभिषिक्त हुए हैं वे ही 'आधा' है। सद्गुरु परम्परा की अनन्त शक्ति उन सबों की सत्ता में सन्निवेशित रहती है क्योंकि वे सभी सद्गुरु समर्पित सत्ताएँ हैं। सद्गुरु ही सद्गुरु को निर्वाचित करते हैं एवं जगत्-कल्याण कर्म में सद्गुरुगणों द्वारा निर्वाचित आधारूपी सद्गुरु की सत्ता के संग ओत-प्रोत भाव में (एक होकर) संयुक्त रहते हैं।

वर्तमान काल में उस 'आधा' संपन्न अनेकों में एक का नाम मैं यहाँ उल्लेखित करता हूँ, वे हैं श्रीविष्णुपद सिद्धांत ठाकुर। इन्हें साक्षात् परमब्रह्म ज्योति-काया धारिणी आदि शक्ति महामाया स्वरूपिणी ने आरंभ में शक्ति संचार कर साधन निर्देश प्रदान कर कठोर तपश्चर्या पालन कराया। तत्पश्चात् ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ऋषि ने महाकारण ज्योर्तिमय दिव्य-देह में आविर्भूत होकर शक्ति संचारित किया। श्रीविष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर को कोई स्थूल कायाधारी गुरु नहीं थे।

सद्गुरु की स्थूल-देह नहीं होने पर किसी ने किसी दिव्य पुरुष से दीक्षा बीज प्राप्त किया, ऐसे आधा भी देखे गये हैं। ये सब सुउच्च कोटि ऋषिकल्प होते हैं। पूर्वजन्मार्जित प्रबल संस्कार के फलस्वरूप ऐसी दीक्षा प्राप्त होती है – वर्तमान युग में कुछ दिन पूर्व ही थी श्रीश्री रांगा माँ एवं श्रीश्री सिद्धि माता। इनके अतिरिक्त बैंगलोर के योगी ऋषि 'अमरा' भी हैं। *...क्रमशः*

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन

(५)

सद्गुरु माहात्म्य – *पूर्व प्रकाशित अंक के पश्चात्....*

श्रीश्रीमाँ – हिमालय में जो साधना करते हैं, उस प्रकार के उच्च अवस्था के योगी, जो सविकल्प समाधि अवस्था में

आसीन हैं उन्हें भी उनके सद्गुरु कहते हैं, ''अभी भी तेरे मन में खोट है। हमारे गुफा में तेरा प्रवेशाधिकार नहीं है।'' – तो समझो सद्गुरु का विश्वस्त होना कितना कठिन है। योगी जब तक निर्विकल्प समाधि अवस्था में उपनीत नहीं हो जाता, तब तक अष्टप्रकृति का खेल सत्ता में चलता रहता है; एवं पूर्णरूप से निर्मल भी नहीं हुआ जा सकता। परिपूर्ण निर्मल सत्ता ना होने पर्यन्त सद्गुरुगण के हृदय का प्रिय नहीं हुआ जा सकता। आध्यात्मिक जगत् में सद्गुरु के अतिरिक्त शिष्य को शिवावस्था कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है, सद्गुरु के विषय में विचार करने की कोशिश मत करना, स्वयं का विचार विश्लेषण कर सकते हो किन्तु उसमें भी जीवन का अनेक मूल्यवान समय नष्ट हो जाता है। अतएव आध्यात्मिक पथ पर सद्गुरु की शरणागति ही एकमात्र साधन है। सद्गुरु के सान्निध्य और शरणागति से ही योग-साधना में उत्तरोत्तर उन्नति होती है। साधारण मनुष्यों को धारणा ही नहीं होती कि महात्मागण किस प्रकार के होते हैं! महात्मागण जितने सरल होते हैं उतने ही कठोर भी हो सकते हैं शिष्य को शिक्षा देने के समय। इसीलिए मन-प्राण से उनके प्रति समर्पणभाव रखना चाहिए। सद्गुरु प्रदत्त चिन्मय-अग्निस्फुलिंग बीजरूप में शक्ति आकार में तुम्हारे मध्य ग्रथित होने पर तभी वह अग्नि-स्फुलिंग fire spark तुम्हें कूटस्थ अभ्यंतर में आकर्षित करेगी। सद्गुरु दीक्षादान के समय तुम्हें समझा देंगे कि कूटस्थ क्या है। कूटस्थ दर्शन होते ही वहीं से आध्यात्मिक पथ पर यात्रा शुरु हो जाती है। साधन करते-करते तब क्रमशः माया को पहचानोगे। जितना सद्गुरु को निःस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे उतना ही माया का स्वरूप तुम्हारे सम्मुख प्रस्फुटित होता जाएगा। तुम्हारे मध्य माया का कैसा

आवरण है, तब तुम वह भी स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। मायामुक्त ना होने से तो आत्मध्यान नहीं होता। तुमलोग मायायुक्त एक जीव विशेष हो। उस माया के रहते हुए तुम योगी होने की चेष्टा कर रहे हो! क्या यह सम्भव है?

हम लोग ॐकार की साधना करते हैं। ॐकार मंत्र मुख से उच्चारित नहीं करते। ध्यान लगातार होगा, यदि ॐकार के सुर में मन रमा सको तो। प्रत्येक के भीतर जो शब्द-ब्रह्म का सुर है, उस ॐकार को, नाद को, उत्थित करने के लिए साधना एवं तपस्या करने का प्रयोजन है। ॐकार के बिना क्या ध्यान हो सकता है? आत्मज्योति के भीतर ही तो ॐकार है। प्रणव के बिना ध्यान चिन्मय नहीं होता। मंत्र के सब बीजरूपी अक्षर प्रणव में ही लय हो जाते हैं। और तुम्हारी देह भी है प्रणवरूपी अक्षर के आकार स्वरूप। हमारे देहाभ्यंतर का सुषुम्ना मार्ग प्रणव अक्षराकार के स्वरूप है। उस प्रणवरूपी देह को केवली प्रणायाम के द्वारा भेद करना पड़ता है। अर्थात्, सुषुम्ना पथ पर सब ग्रंथियों को भेद करना पड़ता है। बिना दीक्षा के सिर्फ spark देखा है और सोचते हो कि बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इससे अच्छा है कि तुम जिस प्रकार हो, और तुम्हें लगता है कि आनन्द में हो, तो उसी तरह रहो। 'चैतन्य-शक्ति के बिना कोई सम्वर्द्धन साधित नहीं होता' – यह ध्रुव सत्य है, इसे समझो। चैतन्यशक्ति ऐसी शक्ति है कि चैतन्य-अग्नि की एक धूनी से और एक धूनी को प्रज्ज्वलित किया जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु अपनी धूनी से लेकर और एक धूनी अर्थात् शिष्य की धूनी को चैतन्य प्रदान करते है। यह सद्गुरु प्रदत्त चैतन्य जन्मजन्मान्तर तक रह जाता है क्योंकि चैतन्यशक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती। अनेक सत्ताओं में माया और प्रारब्ध के कारणों से चिदग्नि मलिन आवरण में ढक जाने के बावजूद भी अन्तर में दीप्त रहती हैं। ऐसे मनुष्यों में जन्मजन्मान्तर गुरुकरण की शुभेच्छा सहज ही सत्ता में जाग्रत रहती हैं। *...क्रमशः*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

पुराण कथा

महाबलशाली नृप देवसेन

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

शिवानुचर भैरव के औरस से ऊर्वशी के गर्भ से 'सुवेश' नामक एक पुत्र ने जन्मग्रहण किया। सुवेश ने गन्धर्वराज धृतराष्ट्र की कन्या से विवाह किया। उस कन्या के गर्भ से सुवेश को 'रुरु' नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के औरस से अप्सरा मेनका के गर्भ से 'बाहु' नामक पुत्र का जन्म हुआ। बाहु के चार पुत्रों में अन्यतम सर्वकनिष्ठ था 'कुमुद'। कुमुद के पुत्र थे महाबलशाली 'देवसेन'। उन्होंने यौवनाश्व मान्धाता की कन्या केशिनी से विवाह किया। देवसेन पत्नी को साथ लेकर काशीधाम में गमन कर महादेव की आराधना में लीन हुए। उनकी तपस्या से सन्तुष्ट होकर महादेव ने उन्हें वर देना चाहा इस पर देवसेन ने कहा, ''जब तक चन्द्र-सूर्य रहेंगे उतने दिनों तक मेरे वंशज काशी के अधिपति हो एवं आप भी उस काल तक मेरे वंशधरों के प्रति प्रसन्न रहें।'' देवसेन के औरस से केशिनी के गर्भ से सुमना, वसुदान, ऋतधृक, यवन, कृती, मीन और विवेकी नाम के सात पुत्रों का जन्म हुआ। परवर्तीकाल में देवसेन ने अपने पुत्रों के ऊपर राज्यभार सौंप कर पत्नी-सह विद्याधर लोक में गमन किया।

विद्याधर लोक के संबंध में – इस लोक में विद्याधरगण वास करते हैं। ये हैं सूक्ष्म-देही देवयोनि विशेष। ये संगीत विशारद् होते हैं। विद्याधरलोक आकाश और पृथ्वी के मध्यस्थान में अवस्थित है। साधारणतया विद्याधरगण सभी का मंगल करते हैं। इस लोक में भी राजन्य प्रथा प्रचलित है। पुराण में उल्लिखित है कि विद्याधरगण इच्छानुयायी चेहरा परिवर्तन कर सकते है अतएव ये लोग 'कामरूपी' नाम से भी अभिहित होते हैं। मनुष्यों के साथ विद्याधरों का विवाह भी सम्पन्न हुआ है। बौद्धतंत्र में भी विद्याधरों के संबंध में उल्लेख मिलता है। ये लोग गौरवर्ण एवं द्विभूज, मुख अति सौम्य एवं सुन्दर। विद्याधरलोक स्वर्गतुल्य सुखमय लोक है। कामना-वासना सम्पन्न पुण्यवानजन विद्याधरलोक में गमन करने में सक्षम होते हैं।

(*कालिका पुराण से संग्रहित कहानी*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (६१) : हमलोगों के श्रद्धेय गुरुमहाराज (श्रीश्रीसरोजबाबा) के आश्रम-गृह में अनेक उच्च योगियों, साधकों, लेखक आदि समस्त जनों का आनाजाना लगा ही रहता था। उनमें से एक साधक लेखक श्रीनिगूढ़ानन्दजी बीच-बीच में गुरु का संग करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को हमारे गुरुमहाराज (श्रीश्री सरोजबाबा) के संबंध में एक अद्‌भूत कहानी सुनाई, वह उनके द्वारा लिखित 'जीवात्मा रहस्य' एवं 'परलोक और जातिस्मर' इन दो कृतियों से ही ली गई है –

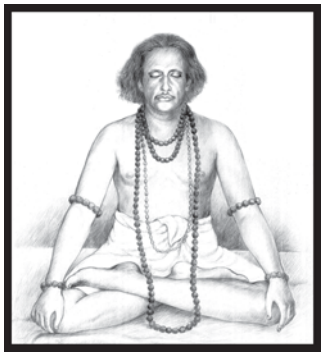

''मनुष्य के जीवनकाल में उसके देह की द्वितीय सूक्ष्म सत्ता अन्यत्र विचरण कर सकती है। योगीलोग ध्यानकाल में अपनी द्वितीय-सत्ता को देख सकते हैं। वे सर्वप्रथम अपनी द्वितीय-सत्ता के पीछे के भाग को देखते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता प्रतिबिम्ब योगी की ओर घूमना शुरु कर देता है। अन्त में वह आमने-सामने हो जाता है। यह हुआ योगी का द्वितीय सत्ता दर्शन। कुलकुण्डलिनी के जागरण के फलस्वरूप ही ऐसा होता है।

कुलकुण्डलिनी के जागरण से देह की शक्तिमात्रा में वृद्धि होने से योगी पदार्थ-विज्ञान के सूत्र के अनुसार ही ये सब देखते हैं। योगी दावा करते हैं ध्यानावस्था में देह की शक्तिमात्रा की वृद्धि होने से वे सूक्ष्म देह से विभिन्न ग्रह ग्रहान्तरों मे जा सकते हैं। शक्तिमात्रा की तरंग के क्षुद्रतर होने के लिए ही दूरदर्शन होता है ऐसा प्रतीत होता है, जैसे अभी विद्युत माध्यम इस पृथ्वी पर रहकर ही भिन्न ग्रह से प्रेरित चित्रों की तस्वीर लेने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही योगीलोग यह भी दावा करते हैं, उनकी सूक्ष्म देह भी उन सब ग्रह के जीवों देख सकती है, कारण, उन्हें देखने पर वे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पर मैंने ऐसे एक योगी को देखा है जिनकी सूक्ष्म देह को लोग देख सकते थे। मेरे प्रकाशक बन्धु श्रीदुलालेन्दु चट्टोपाध्याय को वे सूक्ष्म देह के रूप में दिखायी दिए। वे थे हावड़ा बक्सरा के लाहिड़ी बाबा - श्री सरोज कुमार लाहिड़ी। दुलालबाबु ने कहा था कि वे अलौकिक शक्ति के विषय में बोलते हैं। कहते हैं कि उनके विषय में सोचने से ही वे दिखाई देते है। इस प्रकार के योगी को देखने का कौतूहल मेरे अन्दर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। उनके उस शिष्य का पत्र लेकर मैंने उनके साथ भेंट की। उसके पश्चात् अनेकबार उनके पास गया हूँ। धीरे-धीरे उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। एकबार मैंने उनसे कहा -''आप तो सूक्ष्म-देह में अनेकों को दिखाई देते हैं। मुझे भी सूक्ष्म-देह में दिखाई दीजिए ना।''

उन्होंने कहा - सबके समक्ष तो मैं सूक्ष्म-रूप में प्रकट नहीं हो सकता।

– क्यों?

–वह मैं आपको शब्दों से समझा नहीं पाऊँगा।

– मेरा दूर्भाग्य है कि एक अलौकिक घटना का मैं साक्षी नहीं हो सका।

उन्होंने कहा, सूक्ष्म-देह द्वारा मैं आपके सामने नहीं आ सकता, लेकिन सूक्ष्म-देह से कहीं भी जाया जा सकता है इसका प्रमाण दे सकता हूँ।

–जैसे ?

– आप तो ध्यान करते हैं ?

– थोड़ा करता हूँ।

– आप ध्यान करने कब बैठते हैं?

– रात्रि के नौ बजे।

– आज जब ध्यान करने बैठेंगे तो मैं आऊँगा।

– बक्सरा से रात नौ बजे टॉलीगंज मेरे यहाँ!

– हाँ।

उस दिन रात को नौ बजे मैं ध्यान करने नहीं बैठ पाया। लगता है रात को ग्यारह बजे बैठा था। पर वे आये नहीं। दो महीने के पश्चात् मेरा उनसे मिलना हुआ। मैंने कहा – आप तो उस दिन नहीं आये।

– आया तो था!

– आये थे?

– हाँ, आप तो रात साढ़े नौ बजे ध्यान हेतु नहीं बैठे!

– हाँ।

– आपको कुछ प्रतीत नहीं हुआ ?

तब मुझे याद आया – हाँ मुझे प्रतीत हो रहा था कि कोई

जैसे मेरी दोनों काँख में हाथ लगाकर मुझे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कर रहा हैं। वह बात मैंने उन्हें बताई।

उन्होंने कहा, – तब!

– दिखाई नहीं दिये क्यों?

– सभी के समक्ष तो नहीं आ सकते।

सभी के समक्ष क्यों नहीं आ सकते इसके संबंध में मैंने उनके साथ और कोई तर्क-वितर्क नहीं किया। हाँ इससे मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि योगी लोग सूक्ष्म-देह द्वारा विचरण कर सकते हैं।''

प्रसंग (६२) : इस बार मैं अपने (श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा) व्यक्तिगत जीवन के कुछ तथ्य उजागर कर रहा हूँ। मेरी जन्मकुण्डली में विवाह के संबंध में कुछ रुकावटें थी। मेरे विवाह के लिए मेरी माँ ने आवश्यक कार्यवाही करनी शुरु कर दी। लड़कियाँ देखने के लिए विभिन्न जगहों में जाना पड़ा; जैसे - देउलटि, उलुबेड़िया, उत्तरपाड़ा, बेहाला, कृष्णनगर, शिवपुर, बक्सरा, साँतरागाछि इत्यादि। इसी बीच एक रविवार प्रातः गुरु महाराज के समीप बैठा था। हठात् गुरुदेव ने कहा, ''प्रदीप माँ को कष्ट देकर क्यों विभिन्न स्थानों में लड़कियाँ देखने जा रहे हो। एक सप्ताह के अन्दर ही संबंध हो जाएगा एवं तुम्हारे घर के आसपास के इलाके में ही विवाह होगा।'' अद्भुत रूप से तीन-चार दिन बाद ही मेरे स्कूल के एक मित्र हठात् लड़की के बड़े भैया को लेकर मेरे यहाँ आये। लड़की के छोटे भाई को मैं जानता था क्यों कि वह भी मेरे स्कूल का छात्र था। जो भी हो महागुरु की कृपा से हमारा विवाह सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुआ।''

श्रीश्रीबाबा त्रिकालज्ञ ऋषि थे। त्रिकालज्ञ ऋषि वाक्सिद्ध और भूत-भविष्यत् द्रष्टा होते है।

प्रसंग (६३) : एकदिन मैं संध्याबेला में गुरुदेव के समीप एकाकी बैठा था। कुछ दिन से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था, कि इतने बड़े सद्गुरु के समीप रहकर जीवन में अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो पाऊँगा कि नहीं। यद्यपि उस समय मैं क्रिया-साधन पा चुका था। उस दिन गुरुदेव के पास बैठकर मैं उसी चिन्ता में डूबा हुआ था। हठात् गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, ''देखो, बाबा प्रदीप इस जीवन में जहाज नहीं हो पाए, तो एक मज़बूत नौका तो हो सकोगे।'' मेरे मन में आनंद का संचार होने लगा। सोचा नौका होना भी क्या सहज घटना है! इस नौका का माँझी बनकर ही तो श्रीकृष्ण अपनी महासाधिकाओं सखियों को पार करवा देते थे। *...क्रमशः*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

उन्मेष

(२६)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

गतांक से आगे...

जिज्ञासु – माँ, जप की मात्रा क्या है?

श्रीश्रीमाँ – यह जो घड़ी का काँटा चल रहा है, यह है काल या समय। काल गतिशील है, यह काल के स्पन्दन द्वारा ही व्यक्त होता है। उस स्पन्दन अनुयायी मनुष्य की heart beat भी चलती है – इसे गौर करने से ही समझ में आ जायेगा कि यही है काल अर्थात् स्थूल चेतना में हमारी जो heart beat हो रही है, उसी से समझा जा सकता है कि हम काल की गति में हैं।

प्रत्येक मनुष्य के देह का एक छन्द या स्पन्दन है; देह के उस अन्तर-छन्द में ही मन युक्त कर साधना करते-करते अविरत अभ्यास के फलस्वरूप वह अन्तर्मुख होकर अनुभूति के मध्य प्रकाशित होता है। तब एक ही समय एक ही मुहूर्त में प्रथमतः एक बीज (मंत्र) जप किया जाता है; फिर एक ही मुहूर्त में दो, क्रमशः तीन, फिर चार, पाँच, छह एवं और भी अधिक उन्नत योगी कर सकते है। इसका अर्थ क्या है? – काल को तुम क्षण में विभक्त कर देते हो, जिस क्षण के मध्य प्रवेश कर रहे हो उस क्षण के स्पन्दन के मध्य एक शून्य अवस्था है। वहाँ प्रवेश करते ही तुम्हारे अन्तर में एक प्रकार की अनुभूति होगी, तुम्हारा मन स्थिर हो जायेगा। बोध के द्वारा उस क्षण को पकड़ कर रखने को ही मात्रा करते हैं। परब्रह्म स्तर पर जो सम्वित् है वह नित्य छन्दमय है; उस नित्य छन्द को अवलम्बन करके ही भगवान इस विश्व को सृजन करते हैं। सृष्टि की परिसीमा में वह स्पन्दन

ही है काल की परिव्याप्ति। एक-एक स्तर के मध्य इस काल का स्पन्दनरूपी छन्द एक-एक तरह का भाव की विचित्रता के छन्द में छन्दित होकर विराज कर रहा है।

जप साधना करते करते जो जिस मंत्र का जप करता है, जैसे कोई यदि प्रणव जप करता है अथवा कोई यदि मातृकादि का बीजाक्षर मंत्र जप करता है, तो बीजाक्षर जब चैतन्यमय हो उठती है तब वह प्रणव के साथ युक्त हो जाता है। तब वह अक्षर और नहीं रहता। अखण्डरूप के साथ युक्त होकर आदि-नाद हो जाता है। जब तक बीज कला-सदृश होता है तबतक ही अक्षर सदृश या मातृकावर्ण के स्पन्दन सदृश है, तब बीज में पूर्णता का विकाश नहीं होता है, जैसे एक बीज मंत्र 'क्लीं' या 'ह्रीं' है, तब उस बीजाक्षर में ज्योति का स्फुरण होकर सम्प्रसारित होकर ॐकार में जाकर मिल जाता है उसी समय एक बीज के मध्य पूर्णता का प्रकाश होता है। वैसे ही जो प्रणव जप करते हैं, उनका भी प्रत्येक स्तर पर नाद उत्थित होता है। गीता में कई शंखो के बारे में लिखा हुआ है – एक-एक शंख एक-एक स्तर का स्पन्दन एवं नादध्वनि है। उस ॐकार को लेकर जप-साधना करते करते जब अन्तराकाश में एक अविरत नाद आकाश के मध्य से उत्थित होता है, तब ओम्, ओम् ध्वनि और श्रुत नहीं होती, तब बोधि में बोधगम्य होता है कि 'अ--ओ--म' – सम्प्रसारित प्रणव ध्वनि हो रही है। उस अवस्था में स्वेच्छा से जप नहीं किया जा सकता; तब साधक सिर्फ नादध्वनि सुनते रहते हैं। – यह सब अपनी अनुभूति से कह रही हूँ। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्म-उपलब्धि की अनुभूति से यह सब मैं कह रही हूँ। *...क्रमशः*

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

सत्ता के स्वभाव में जब अहंकार निर्लिप्त, निष्प्रभ, निष्काम भाव में पूर्ण हो उठता है तब सत्ता विशुद्धाकार में प्रतिभात होती है एवं तभी विशुद्ध व्यक्तित्व मध्य ईश्वरत्व का परिपूर्णाकार में प्रकाश होता है। इस अवस्था में वह सत्ता भी ईश्वर के प्रतिभू रूप में परिगणित होती है। इसको ही महासत्ता का महाभाव कहा जाता है।

–श्रीश्रीमाँ रचित 'सृजा' पुस्तक से उद्धृत

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ५०: 'माँ काली' कृष्णवर्णा क्यों है?

उत्तर : परमब्रह्म स्वरूपिणी माँ परमब्रह्म की चितिशक्ति – परमब्रह्म के गाढ़े-घने तमपूर्ण आकाश के मध्य योगीगण माँ के विद्युत् झलक के सदृश अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इसीलिए माँ मोक्षदायिनी काली कृष्णवर्णा है। ये ही परवर्ती में कलनमयी होकर कालरूपा ईश्वरी होती है – यही कारण है माँ काली (काल + ई = काली), परमब्रह्म का आदि प्रकाश रूप ही है 'काली'।

प्रश्न ५१: भक्तियोग में 'total surrender या पूर्णसमर्पण' किस अवस्था को कहा जाता है?

उत्तर : भक्तियोग के नवधाभक्ति के आत्मनिवेदन या पूर्णसमर्पण से ही 'ब्रह्मसंबंध' स्थापित होता हैं – यह पुष्टिमार्गस्थित मोक्षमार्ग का साधन है; इस साधन के फलस्वरूप कैवल्यलाभ और नित्यभूमि में स्थिति होती है। श्रीभगवान के साथ किसी प्रकार भी यदि एकबार आत्मिक संबंध स्थापित हो जाए तो सर्वदु:खों का विनाश साधित होता है, यहाँ तक कि मायिक आवरण उन्मुक्त होकर सत्ता की चिरमुक्ति होती है। फिर कभी-कभी श्रीभगवान के निर्देश से वे समस्त दिव्य सत्ताएँ मर्त्यलोक में विशुद्ध देह धारण कर जगत् में 'ब्रह्म संबंध' दीक्षा दान से प्रकृत भक्त योगी को श्रीभगवान के धाम ले जाते हैं एवं जगत् में श्रीभगवान के अस्तित्व की महिमा का प्रचार कर जाते हैं।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

पंचकेदार के पथ पर

(१)

गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकानन्दा, मन्दाकिनी, नन्दाकिनी, पिण्डार और भी असंख्य उपनदियाँ, शाखा नदियों का आदिस्रोत है यह हिमालय। पाइन, देवदार, मैगनोलिया, रडोडेनड्रन, जुनिपर पुष्प से भरा हुआ हिमालय। हेमकमल, श्वेतकमल, ब्रह्मकमल का देश हिमालय, सदाबहार आनन्दमय हिमालय, जिसके आकाश और वायु में निर्मल आनन्दधारा प्रवाहित होती है। तीव्र और अवर्णनीय आकर्षण उसके प्रत्येक शिलाखण्ड से झलकता है। हिमालय के जिस किसी प्रान्त में यदि किसी ने अपने कदम रखे हैं, तो वह हिमालय की करुणाधारा से अवश्य ही स्नात हुआ है इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हिमालय के प्रभाव से ही होता है हिमालय के प्रति आकर्षण। उस आकर्षण और मनोहर दृश्यों से आकृष्ट होकर ही मनुष्य हिमालय की ओर बार-बार खींचा चला जाता है, और गढ़वाल तो हिमालय का एक ऐसा अमोघ आकर्षक स्थल है मानों हाथ से इशारा करके हमें बुला रहा हो। महाभारत युग से प्रारम्भ कर वर्तमान अवधि गढ़वाल हिमालय का प्रत्येक क्षेत्र, उसका प्रत्येक टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता, चढ़ाई-उतराई हिमालय प्रेमी मनुष्य की तीर्थभूमि, पुण्यभूमि, अभियात्री का स्वप्नलोक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंचकेदार, सप्तबद्री – हिमालय के एक-एक देवगृह है। गौरीकुण्ड, ऋषिकुण्ड, सूर्यकुण्ड, रूपकुण्ड, हेमकुण्ड, नागकुण्ड, रक्तवरण, श्वेतवरण, गोमुख तपोवन के देवताओं के चरणों में अंजलि प्रदान करने के एक-एक अर्घ्यमात्र है। केदारताल, वासुकिताल, भोभिताल हिमालय के भिन्न-भिन्न रूप है।

केदारनाथ

वर्ष २०१०, समय था महालया की पुण्य तिथि। मातृआराधना, मातृवन्दना में लीन बंगभूमि। उपासना-एक्सप्रेस से यात्रा का शुभारम्भ हुआ। गन्तव्य था हरिद्वार। मस्तिष्क में सिर्फ पंचकेदार की रूपरेखा बन रही थी। केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, हिमालय के पाँच दुर्गम शैवतीर्थ क्षेत्र। महाभारत में वर्णित पंचपाण्डवों के पंचतीर्थ, पंचकेदार।

दूसरे दिन सन्ध्या में उपासना-एक्सप्रेस यथासमय अपने निर्दिष्ट गन्तव्य हरिद्वार पहुँच गयी। वही पूर्वपरिचित हरिद्वार। देवताओं का प्रवेशद्वार पार कर शिवभूमि का प्रथम सोपान। दीर्घ परिक्रमा के अन्त में सुरधुनी गंगा का पवित्र स्पर्श पाती है समतल भूमि। योगी महात्माओं की तपोभूमि और चारोंधामों का प्रवेशद्वार, तीर्थयात्रियों, भ्रमणार्थियों के चरणस्पर्श से पवित्र हुआ प्रत्येक शिलाखण्ड। हरिद्वार चिरनवीन, चिरचंचल, सम्पूर्ण व्योम और पवन में देवताओं का स्तुतिगान। संध्या में ब्रह्मकुण्ड की आरति, पत्तों की नौकाओं में जलता हुआ प्रदीप प्रियजनों की स्मृतिचारण में, सुभाषघाट में दीपों की माला, जल में मत्स्य-क्रीड़ा। गंगा के दोनों तटों पर असंख्य देव-देवालयों में बजते घण्टा-शंखध्वनि।

एक रात हरिद्वार में व्यतीत कर प्रातः ही प्रस्थान किया ऋषिकेश के लिए। वहाँ से बस पकड़कर सीधा गौरीकुण्ड, लेकिन आज के गौरीकुण्ड का स्वरूप पहले जैसा नहीं है। वर्ष २०१२ में प्राकृतिक विपदा के फलस्वरूप वह ध्वंसस्तूप में परिणत हो गया। गौरीकुण्ड में एक रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन प्रातः शुरु हुई पदयात्रा। पथ की दूरी १४ कि.मी, गन्तव्य केदारनाथ। सात किलोमीटर की यात्रा के पश्चात् अंत में हमलोग पहुँचे रामवाड़ा में। यहाँ से और भी ७ कि.मी की चढ़ाई के पश्चात् पहुँचेंगे केदार भूखण्ड में – केदारनाथ के द्वार पर। रामवाड़ा के पश्चात् ही वहाँ की प्राकृतिक शोभा में बदलाव होना शुरु हो जाता है। जैसे-जैसे ऊपर चढ़े एवं जितनी बार मोड़ घूमें उतनी बार ही एक-एक कर के उन्मोचित होने लगे केदार शृंग के अलग-अलग रूप। धीरे-धीरे आ पहुँचे गरुड-चट्टी। यहाँ से ही सर्वप्रथम दिखाई देता है केदारनाथ का मन्दिर। धीरे-घीरे पथ की ओर अग्रसर होने लगा, चलते-चलते केदारनाथ मंदिर के प्रांगण

में आ पहुँचा। ऊँचाई ११७६० फुट। योगीराज शंकर की लीला भूमि। केदारखण्ड में प्रकृति ने हृदय खोलकर अपने समस्त ऐश्वर्यों को बिखेर दिया है। युगों-युगों से हिमालय का शृंगार किया विभिन्न उपादानों और विचित्र छन्दों से। उसके रूप के सौन्दर्य-रस का आकण्ठ पान कर लेने से भी तृप्ति नहीं होती। केदारभूमि की आकाश-वायु प्रशान्त है। यह भूमि ऋषियों का तपोक्षेत्र, तीर्थयात्रियों की देवभूमि, भ्रमणार्थियों का स्वप्नलोक है। केदारभूमि का स्पर्श भ्रमणार्थियों को मतवाला कर देता है। अन्तर में अनुभूत होता है अध्यात्म चेतना का स्पन्दन। केदारखण्ड में ऐसी सम्मोहन शक्ति है कि मैं स्वयं की ही सुधबुध खो बैठा। केदारभूमि के सान्निध्य से अथवा केदारखण्ड में रात्रियापन करने से यह अनुभूति होगी ही।

कुरुक्षेत्र के युद्ध में आत्मीय-स्वजनों के निधन के पापमोचन के उद्देश्य से पाण्डव उत्तराखण्ड आऐ। कैलाशपति की कृपा-प्राप्ति की आशा से उन्होंने गढ़वाल के नाना क्षेत्रों में परिभ्रमण किया। दर्शन देने के अनिच्छुक महादेव महिषरूप धारण करके महिषों के झुंड में शामिल हो गये। छल पूर्वक भीम ने हाथ-पैर प्रसारित कर पथ अवरोध किया। जो वास्तविक महिषों का समूह था वह भीम के प्रसारित हाथ-पैर के बीच में हुई फाँक में से सहज ही निकल गया परन्तु छद्मवेशी महादेव की मर्यादा को आघात लगा। वे पीछे मुड़कर भागने लगे। चतुर भीम का अनुमान गलत नहीं निकला। उन्होंने भी अनुसरण किया। विरक्त शिव आत्मगोपन के लिए उद्यत हुए। उसी समय भीम ने महिषरूपी शिव को पीछे से कसकर पकड़ लिया। महादेव प्रस्तर में परिणत हो गये। पाण्डवों ने इस स्थान पर मन्दिर का निर्माण कर महादेव की पूजा और प्रार्थना का शुभारम्भ किया। तभी से यह स्थान केदारभूमि के नाम से परिचित है। अनादिकाल से ही महिष के पृष्ठ भाग के सदृश शिला देवरूप में पूजित होती चली आ रही है। मन्दिर के चहुँओर पत्थरों से निर्मित घेरा था। प्रधान दरवाजे के समक्ष शिव का वाहन शिला-निर्मित वृषमूर्ति और त्रिशूल। प्रवेश द्वार के दायीं ओर सिद्धिदाता गणेश, भीतर में माँ भगवती, बायीं ओर माँ लक्ष्मी, मध्य में पंचपाण्डव। थोड़ा आगे बढ़ने पर गर्भ मन्दिर में शिला मूर्ति के रूप में केदारनाथ। मन्दिर के प्रांगण में कुछेक कुण्ड हैं - अमृतकुण्ड, रेचककुण्ड, ब्रह्मकुण्ड। मन्दिर प्रांगण से आठ कि.मी दूर है वासुकिताल। मन्दाकिनी पुल के बायीं ओर से होकर रास्ता जाता है वासुकिताल की तरफ। वहाँ से उत्पत्ति हुई है वासुकिगंगा की। सोन-प्रयाग में वासुकिगंगा आकर मिली है मन्दाकिनी से। एक रात्रि केदारखण्ड में व्यतीत कर लौट आया गौरीकुण्ड में। लौटते समय वृष्टि हो रही थी। एकाकी पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। आस-पास कोई नज़र नहीं आ रहा था। अन्य यात्रियों ने इधर-उधर आश्रय लिया। लेकिन मुझे लौटना होगा। माँ का नाम लेकर आगे बढ़ रहा था। हठात् एक वृद्धा के साथ मुलाकात हुई जो इस तूफान में एकदम अकेली उतर रही थी, गौरीकुण्ड था उसका लक्ष्य। दैहिक सामर्थ्य, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का संमिश्रण देखकर तो मैं अवाक् रह गया। उनके आचरण और बातों से अत्यधिक विश्वास झलक रहा था। उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व से एक अद्भुत शांति झलक रही थी, किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं, साथ में टॉर्च नहीं, बरसाती नहीं, पाँव में हवाई चप्पल, शीत-वस्त्रों के नाम पर सामान्य एक चद्दर, हाथ में लाठी। उनके मन के तरुण साहस ने शायद उम्र को पराजित कर दिया था। बुढ़ी माँ को मैंने रास्ता दिखाया। मेरी टॉर्च के आलोक ने उनकी मंथर गति को तीव्र कर दिया। प्रसन्नता उनके चेहरे से स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी, ''मुझे आलोक दिखाने के लिए केदारनाथ ने तुम्हें भेजा है।'' उनकी इन बातों से मैं अवाक् हो गया। वृद्धा हिमालय के आस-पास के अनजाने स्थानों में भ्रमण करती रहती थी। अभी भी घूमती है। हिमालय के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। प्रतिवर्ष वे केदार आती हैं, देवस्थल में पादुका वर्जनीय हैं इसीलिए खाली पाँव ही हिमालय-भ्रमण करती है। किसी एक सन्तान के विशेष आग्रह के कारण ही वे हवाई चप्पल पहनती हैं। देखते ही देखते हमलोग गौरीकुण्ड पहुँच गये। प्रवेश करते ही सम्मुख में था एक अस्तबल। वृद्धा ने अस्तबल के एक घर में प्रवेश किया। मैं उन्हें विदाई देकर कुण्ड के किनारे चला आया। प्रातः वृद्धा की खैरियत जानने के लिए अस्तबल गया, लेकिन ऐसी किसी भी वृद्धा की यहाँ देखभाल करनेवालों को जानकारी नहीं थी। मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया। वे क्या सत्य ही बुढ़ी माँ थी! अथवा बुढ़ी माँ के छद्मवेश में कोई अन्य? अर्थात् यह भी क्या गुरुमाँ की लीला थी! *...क्रमशः*

–मातृचरणाश्रित श्री सौरभ बसु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आश्रम समाचार

१४ जनवरी – श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं के आसन प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर अखण्ड महापीठ आश्रम में वार्षिक

उत्सव अनुष्ठित हुआ। श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं की पूजा और यज्ञ अनुष्ठित हुए। दोपहर में हमारे गुरुभाई और बहिनों के अक्लान्त परिश्रम से अनेक भक्तवृन्दों ने अत्यंत परितृप्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया। संध्या के समय आयोजित गुरु भाई-बहिनों द्वारा परिवेशित भजनों के पश्चात् पण्डित गिरिधारी नायक के ओड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों ने नृत्यपरिवेशन किया। अनुष्ठान के प्रारम्भ में हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या प्रकाशित हुई।

३ फरवरी – श्रीश्रीमाँ आश्रमस्थ कुछेकजनों के साथ होटोर आश्रम के वार्षिक उत्सव में गई। वहाँ पर श्रीश्रीमाँ की पूजा और आरती के माध्यम से श्रद्धाज्ञापन किया साध्वी सुचेतानन्दमयी और साध्वी पुण्यानन्दमयी ने। आश्रम की अन्य सन्यासिनियों और शिष्याओं ने एक-एक करके श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया। परिशेष में आश्रम के विद्यार्थियों ने एक सुन्दर सांस्कृतिक अनुष्ठान का परिवेशन किया।

९ फरवरी – इस दिन आश्रम में रवीन्द्रसंगीत परिवेशन किया सुप्रसिद्ध गायक श्रीसुब्रत सेनगुप्त ने। उनके श्रुतिमधुर

योगदा सत्संग सोसाइटि में श्रीश्रीमाँ

संगीत ने उपस्थित भक्तों को विमोहित कर दिया।

२ मार्च – श्रीश्रीमाँ ने योगदा सत्संग सोसाइटि में पधारे।

४ मार्च – शिवरात्रि की मध्यरात्रि में आश्रम में प्रतिष्ठित परमशिव की पूजा अुनष्ठित हुई।

२१ मार्च – दोल पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आश्रम में दोपहर में श्रीश्रीराधामाधव को भोग निवेदित किया गया। संध्या में नृत्यानुष्ठान का शुभारंभ हुआ शिशु शिल्पी समादृता बसु के नृत्य से। उसके बाद पण्डित गिरिधारी नायक की

शिष्याओं ने वसन्त-उत्सव पर आधारित मनोरम नृत्यानुष्ठान परिवेशित किया।

२४ मार्च – आध्यात्मिक सभा के ३० वें पर्व पर कठोपनिषद् प्रसंग पर मातृचरणाश्रित श्रीश्रीमाँ के संतान डा. वरुण दत्त ने अपूर्व व्याख्यान दिया।

१३ अप्रैल – नवरात्रि की अष्टमी तिथि में प्रात:काल श्रीश्रीअन्नपूर्णामाँ की पूजा सम्पन्न हुई अन्नपूर्णा मंदिर में। पूजा और भोग निवेदन के पश्चात् उपस्थित समस्त शिशुओं और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।

१४ अप्रैल – इस दिन की पावन संध्या पर आश्रम मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य पर श्रीश्रीमाँ के अपूर्व गीतों से सुन्दर भजनों का अनुष्ठान हुआ।

आगामी अनुष्ठान सुची

बुद्ध पूर्णिमा - १८ मई , शनिवार
अध्यात्मिक सभा – ३० जुन, रविवार
गुरु पूर्णिमा – १६ जुलाई, मंगलवार

Bhagwan Krishna-Dwaipayan Vyasa

Supreme's Chosen Teacher, Chronicler and Leela Orchestrator

The name of Bhagwan Krishna-Dwaipayan Vyasa immediately draws reverence and the image of a multifaceted Divine Being, yogi, scholar, teacher, poet, story-teller and a sublime master who is always one with the supreme, yet ever present in creation constantly chronicling, orchestrating and participating in the ever happening divine leela for the benefit of mankind that is sometimes visible but mostly unseen by people like me. His documented achievements are unparalleled. His classification of the scattered revelations of knowledge (the Vedas) into four / five basic groups (Rig, Sama, Yajur – Shukla and Krishna, and Atharva) and structuring each into the format of Mantras, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads have helped retain and revive these priceless revealed jewels of eternal knowledge from being lost by fractured dissipation. Thus he is also known as 'Veda Vyasa'.

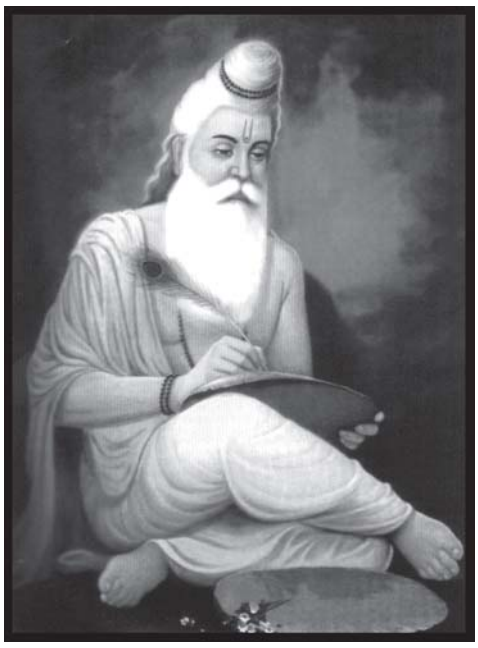

Bhagwan Krishna-Dwaipayan Vyasa

He is the author of the magnificent Mahabharata and its crown diamond the Shrimad Bhagwad Gita, which is not only a wonderful tale of life and literature in the form of immaculate Sanskrit verse but more so a comprehensive description of this sub-continent's arguably most priceless gift to humankind – yoga as the path of self-realization and the goal of life. From our childhood we hear the great story of his authoring the Mahabharata with Lord Ganesha as the scribe. Lord Ganesha agreed to be his writer if he composed as fast as Sri Ganesha would pen it down. Sage Vyasa then gave a counter condition that Lord Ganesha would have to absorb the meaning of the verse completely before he inked it. This arrangement helped Vyasa-dev to get enough time to compose the next set of verses while Lord Ganesha meditated to fully understand the depth of the current verses before writing them down. He is the chronicler of the eighteen principal Puranas and then of the Bhagwat Samhita, which is most widely known and loved as it depicts the life and times of Lord Krishna and Vrindavan. It also presents the deep inner path of self-fulfillment beyond the stage of basic self-realization and charts the course of devotional love as the ultimate goal. In the name of sage Badarayana, he composed the Brahma-Sutras, which contains the essence of the Vedanta. He is also said to be the author of the Yoga Bhashya, a commentary on the Yoga-sutras of Patanjali.

His illustrious disciples ranging from Sages Sumanta, Jaimini, Poila, Vaishampayan, Asit and Debal including his divine son Shukdev, have made wide-ranging contributions by absorbing, realizing, detailing, commenting, teaching

and adding new insights to Vyasa-dev's stupendous contributions. From the holy caves of the mighty Himalayas to the pristine grounds of Naimisharanya, all bear vibrational marks of the supreme saint-sage. From various titbits of tales and descriptions, we understand that he continues to guide the world from his Himalayan abode, descending once in a while in new forms for the benefit of the world. It is said that scholar saints Adi Shankaracharya and Madhavacharya were all taken to his secret Badrikashram in astral journeys for guidance for their life's missions as modern apostles of the Vedantic Philosophy. Being a divinely designated Sadguru and for his enormous contributions as a Teacher of Universal Truth, it is not unnatural that his birthday is celebrated as Sri Guru Purnima, or the Full Moon Day in honour of the Guru.

"He is a special creation of the divine", remarked Sree Sree Maa as she revealed some deep insights from her own realization, "A rare sage who is capable of not only participating in divine leela but directing the divine descent, like in the case of Lord Krishna and enabling the manifestation of the Vrindavan Leela and Mahabharata Leela in the material world, leaving imprints of eternal vibrations that are felt even now. He has been part of publicly manifested Krishna-leela ever since, but that is not known to all. When Lord Chaitanya Mahaprabhu descended, he was there as the legendary philosopher saint Sri Vallabhacharya, whose meeting with Lord Gouranga enabled the culmination of Vedantic Philosophy with Devotional Vaishnava principles. Following on the leela of Lord Gouranga, he manifested as Rasikananda Prabhu, who along with Shyamananda Prabhu spread the message of devotional love and service. Rasikananda Prabhu's Samadhi is still there in the famous temple of Kshirchora Gopinath in Odisha. When the supreme reappeared as Prabhu Jagadbandhu, he took birth as Bhagwan Kishori Mohan, leading a very secluded life, manifesting what Pandit Gopinath Kaviraj mentioned as 'Kalite Aishwarik Leela' or 'Divine Leela in Kaliyuga'. Bhagwan Kishori Mohan's letters convey the quintessential message of the Vedanta and Bhagwad Geeta of the unified approach of Karma-Gyana-Bhakti. His disciples have quietly mentioned about how he enabled supreme divine leela-bliss experience by a mere glance or touch as well as how he could be present in multiple places simultaneously. But he had not allowed publication of these during his lifetime. Since he was the Guru of my paternal great grandmother, grandfather and our entire family, we had many photographs, incidents, life details and manuscripts. He was also requested by the great Yogi Pranabananda (disciple of Sri Sri Shyamacharan Lahiri of Kriya Yoga lineage) to take care of his disciples and reside in the Pranabananda Ashram as the spiritual master. He had also met Sri Ramakrishna Paramhansa and both were very fond of each other. I have felt the blessings of this great divine being from my childhood and do so even now."

Sree Sree Maa continued, "This prodigy (Veda Vyasa) was born to Sage Parashara (son of Shaktri and grandson of Vasishta) and Satyavati (daughter of a fisherman-king) on an island (dweep) on the banks of the river Yamuna. He was dark complexioned (Krishna). Thus he was known as Krishna-Dwaipayan. Parashara's penance appeased Lord Shiva who assured him of a son worthy of his great lineage. He sought permission from his mother to leave for tapasya and

assured her that he will be with her whenever she desires to see him. He transcended every stage and performed sadhana in every pilgrimage. With Kaliyuga approaching, he was tasked with the duty of preserving the major knowledge systems so that they are not lost in the coming dark ages. Thus he embarked on his grand missions of creating a priceless legacy as mentioned earlier, most of which survives to this date. He is considered an avatar of Lord Vishnu in the longer list of Vishnu Avatars.

During his period of sadhana, he approached Sage Sanat Kumara and asked, 'What are the works to be performed in Kaliyuga to attain freedom from worldly bondage?' Sage Sanat Kumara advised,'Darshan of Shiva's Jyotirlinga in Varanasi will help attain liberation'. In yogic spiritual terms, Varanasi is located in the agna chakra (between the eyebrows). Upon placing the mind there, one can visualize a bluish tinged brilliant white jyotirlinga form. That is Vishwanath (Lord of the Universe) or Visweshwar. Thereby, when this Light is embraced by the Annapurna Shakti (nourishing power of inner fulfillment), one can enter the yogic path of reaching the Sahasrara (thousand petal lotus) and transcending it to attain moksha (liberation). The physical location of the city of Varanasi is the point where the higher levels of consciousness appear in the physical for easier realization for true aspirants and is a central focal point in spiritual evolution.

The Supreme Divine tests everyone, including great masters, in unique ways such that they form lesson stories for others in times to come. Let me relate one such event which occurred with Sri Veda Vyasa. Once while he was residing in Varanasi as a sadhaka who survived only on alms (bhiksha), Lord Shiva asked Devi Parvati (who presides as Mata Annapurna in Varanasi) to test Vyasa-dev by ensuring that he does not receive alms from any place. That day he failed to receive any bhiksha. The same thing happened next day too. Getting a bit suspicious, Vyasa-dev asked his disciples to investigate. However, they failed to get to the bottom of the matter and reported back that while none gave any alms to the sage, most of them had surplus. That made the issue more intriguing. An extremely annoyed sage Vyasa cursed the citizens of Kashi (old name of Varanasi) in a harsh tone saying, 'Since the residents are so disinclined to donate, they will lose their acquired knowledge and liberation in three generations'. Now feeling extremely hungry, he again made his way through the streets to seek something but failed this time too. Finally late in the evening when he was returning home dismayed and dejected, the goddess appeared before him in the form of an ordinary home-maker. She informed the sage that her husband had decided to feed one person every day before taking food but unfortunately could not find anyone today to accept the invitation. So her husband had remained without food the whole day. She requested the sage to come to her home to be fed. The sage said that he was ready to accept the invitation provided she and her husband could feed him and all his disciples. The good lady agreed and asked them all to come over. They were offered and fed to their heart's content. After the meal, the Devi asked the sage to tell them about dharma or path of righteousness. The sage first explained the dharma of a pious wife. When she was not satisfied, he then went on to extoll the virtues of good living and articulated aspects such as not speaking harsh words to hurt others, to act with

discrimination and for the benefit of the place of dwelling, etc. Hearing this, the Devi asked him, 'Which of these virtues do you have?' The sage remained silent and did not reply. At this point the husband (Lord Shiva) interjected and in a sarcastic manner spoke to the sage, 'You have all the good qualities you mentioned. You are also extremely pious and an ardent follower of dharma. However, tell me, what punishment is due to a person, who gets angry and curses others, due to his own desires not being met?' The sage responded by saying that the curse boomerangs on the person who wrongly curses another. At this point, Lord Shiva appeared in his true form and admonishingly said, 'But you have yourself unnecessarily cursed the citizens of this city in anger for something that you were ill-fated to face. Therefore you do not deserve to stay here now'. Hearing this castigation from Lord Shiva, Sage Vyasa expressed sincere regret and remorse and requested for pardon. He was then allowed to visit only twice a month. Later through deep penance and tapasya, he attained the blessings of Lord Shiva and Devi Parvati and regained complete and uncontrolled access to the holy city. Through this incident the supreme showed how even the divine Ishwarkoti Beings can be affected by the influence of worldly maya and suffer for it.

The sage then opted for a married life and married Vatika, daughter of Rishi Jabali. They had an illustrious divine child Shri Shukdev, who was trained by the best of sages including Vyasa, Janaka and the like. The details of Vyasa's advice to Shukdev are documented in details in the Shanti Parva, Anushashan Parva and Swarga Parva of the Mahabharata. These bear the quintessential stamp of Vyasa's Karma-Gyana-Bhakti triad for liberation in life and devotional service for eternal bliss in the company of the Supreme.

After his stupendous efforts of restructuring the Vedas, composing the intricately complex (both in literal and yogic terms) Mahabharata, the many Puranas, Brahma-Sutra and the like, he remained dissatisfied and a feeling of emptiness engulfed Vyasa-dev. Sage Narada approached him saying, 'O great sage, why do you look so morose and depressed? You have achieved all the knowledge of Brahman that one can attain?' The sage replied, 'Yes O Muni-dev, I have acquired a lot of deep knowledge and disseminated the same. But my soul is not satiated. Can you tell me the reason?' Smilingly Narada, the master of Bhakti replied, 'You have written so much about the aishwarya (glorious power) of the supreme and the path to freedom from bondage, but you have not written about his even more glorious qualities of madhurya (loving radiance) and the path of service to the supreme by which even this earthly life and beyond are full of eternal bliss. Please write about these great glories of the supreme. These incidents, written even in ordinary language, touch both the individual and the supreme directly.' Hearing this, Sage Vyasa sat on the west bank of the river Saraswati, in Samyaprash Ashram and meditated. Due to him attaining the state of pure devotion, he was blessed and able to view the whole of creation in a new perspective and how divinity and Supreme's love is impregnated in every cell and moment of creation and beyond. Not only the ordinary, even many advanced sadhaks are completely unaware of this deep secret of the Supreme's ever presence and play. He therefore composed his magnificent 'Bhagwat Samhita', of the life, times and glory of the Supreme Being. Here again the

stories themselves intrinsically contain the force to autonomously reveal to the devoted the secrets of divine life within and without. This remains his unparalleled contribution. His works remained the key ship on which Sanatan Dharma survived the upheavals of dark ages that came with the advent of Kali Yuga."

Sree Sree Maa stopped. I asked, "Tell us more about your connection with him." She responded by saying, "Bhagwan Kishori Mohan (Vyasa-dev's latest incarnation) was the Guru of my great grandmother and my paternal side including my grandfather, aunts and uncles right down to my parents and our generation. Everything in the family is centered on him. I was blessed with the Siddha Vasudeva Mantra derived from him through my great grandmother. I have been privy to many divine incidents which you will consider miracles but they are part of his divine presence. When my great grandmother Sarala Bala Devi would offer Bhog Prasad to Bhagwan (in his physical absence), a beautiful scented aroma would spread and she would confirm that he has come and blessed it. When I was three, astrologers predicted that I would die very young. So a directive came to get me 'married' to Bhagwan, a Lord Krishna incarnate. Thus at the age of three, I was 'married' to the portrait of Bhagwan Kishori Mohan that is worshipped at our house, with all rituals completed with full rigour. Later, when I met Sri Sri Baba (Sri Saroj Baba), one day he told me that Bhagwan has now asked him to 'transfer' me to Sri Saroj Baba's guardianship. So we sat on asanas to perform the 'handover'. A special asana and hookah was kept for Bhagwan Kishori Mohan. After some time, we could clearly smell the smoked tobacco. Sri Sri Baba confirmed his presence and said that Bhagwan had remarked that since Sri Sri Baba was now there, he need not come to look after them anymore. Sri Sri Baba informed him that Bhagwan's presence was very much needed and requested Bhagwan to keep appearing and blessing not only me but all others. Bhagwan smilingly agreed. Thus his presence is felt again and again. It is he who gave permission to have his letters and books like Kalite Aishwarik Leela of Gopinath Kaviraj published now and his photo put there and made publicly available. His picture and information about him is now made available on the Internet. He had remarked, 'About a century hence, when my name again becomes known to the world, time for my reappearance will come.' We are approaching that time. With him, inevitably comes Lord Krishna. I am eagerly looking forward to a new leela."

Again Sree Sree Maa paused and I asked. "How are you two eternally connected?" I asked. She smiled and gave a few hints. I remembered our visit to his Varanasi Pranabashram with Sree Sree Maa and the discussions there as well. These were good enough to connect several dots.

Let me pause for now with a prayer for all of us seeking his divine grace,

O doyen of sages,
Vyasa of the ages,
Gita's revealer,
Bhagwat's unveiler;
Kishori's Mohan,
Bhakta's Bhagwan,
Thy gaze enlightens,
touch love-lightens;
Give us a place,
in that gaze-space,
For body-mind-heart,
to be thy part.

–Sri Partha Pratim Chakrabarti,
Her Blessed Child

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 11

The technique of restraining the mind – 1

Bhakta: O Lord! This turbulent mind, which make the false world appear real and thereby make me undergo the infernal sufferings, reside verily within my body. Even then, why can't I grasp the mind? How can I restrain this mind?

Mahatma: My son! The art of catching the snake requires intimate proximity to the snake-charmers and learning the signs and signal of capturing the snakes. Only by reading the rules written in the books, nobody ventures to go near a snake hole to pull the snake by catching its tail. Similarly to grasp the mind snake, only learning scriptures doesn't suffice. Only the masters, who have successfully restrained their minds, are aware of the techniques. Thus, mind can be arrested on the basis of courage, by following the great masters so that we come to know how the mind-snake hides and in which hole and come to know the technique of pulling it out. Every human has the strength and right to look at his mind and investigate its psychology. This mind psychology is known as 'Ishwar Tattwa'. One who can cognize the mind-psychology attains such immense power that he can get the answers to all questions of the world from his mind. When you realize this mind-psychology or any truth of the inner world, you can easily understand different truths of the outer world because the outer world becomes naturally tamed then.

Bhakta: O merciful! It is my firm conviction that I can enslave the mind with your company. Hence kindly advise me the art of mind control.

Mahatma: O seeker of truth! If you always keep an eye on your mind, with the clear intention of mind-control and always contemplate that, 'my mind is distinct from my body', then you can easily capture your mind. As you are in the company of truth and go on hearing the ontological knowledge, your mind will slowly get the power to scrutinize. This judgment will slowly magnify the faults of your mind. As you closely introspect your mind and and discover its faults, your mind will slowly surrender to you. Then it can no longer continue lordship on you by exploiting like before. You have so long not judged the right or wrong of the actions of the mind or have found any fault with it. Hence your mind has exercised supremacy over you through lives together.

My son! First mind, then knowledge of bondage and liberation and thereafter this visible world has been created through imagination. This world is the resolution of the mind i.e. mind sheltered in itself has blossomed into the world. The transformation of the mind is the world like an eddy in water. The three worlds comprising of country, time, action, materials, day and night, etc are reflected into this mental Brahman. Thus the man, who is ignorant of his mind, faces this miserable visible world projected by the mind.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Knowledge leads to unity, but Ignorance to diversity. **—Sri Ramkrishna Paramahansa**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(30)

All communities prescribe worship of their cherished Deities as God. When such worship is conducted by ascribing qualifications associated with the Deity in accordance with the divine spiritual scriptures, it may be considered as essentially the revered contemplation of the One Universal God–the *Brahman*. It is therefore improper and unjust for a spiritual sect to look down upon or be hateful towards another sect, as the ultimate objective of all spiritual streams of thought is to attain *Brahmic* consciousness. Hatred, grudge and envy among religious communities may be observed to have attained enormous proportions. Although, the external mechanisms and practices of different spiritual sects may be distinct from one another, all of them are characterized by the same internal principles and essential goal. Understanding this fundamental fact, all forms of aversion and enmity should be relinquished. The Bhagwat Gita says,

Na hinasty-atmana atmanam
tato-yati parang-gatim.

Meaning: (By having an impartial attitude, beholding everything as expressions of the one Universal Consciousness) one prevents the mind from degrading the embodied self, and thereby reaches the Supreme destination.

On the contrary, through aversion or envy towards others, the mind actually disgraces and degrades its own self. Therefore, those with a genuine desire to seek the Truth, should part with all forms of antipathy, spitefulness and quarrels. Otherwise, penance becomes futile and nothing worthwhile can be attained through it. The *Shastras* have asserted that both sects, those who claim to be followers of *Hari* but are inimical of *Shankar*, as well as those who claim to be *Shankar*-devotees but possess animosity towards *Hari*, are damned to hell. Different spiritual sects should look upon each other with an attitude of oneness and harmony. This fills the heart with openness and generosity. How can *Brahmic* consciousness develop within if the mind is not purified and inclined towards spiritual exposition? The *Brahman* is situated within everything, this is the *Sruti*'s assertion.

Observe how the *Bhagwadgita* establishes the essential similarity in the principles of *Sankhya* and *Yoga*, in spite of them being two distinct paths towards realization and having significantly divergent views and tenets. We find in the *Bhagavad-Gita*,

Sankhya-yogau prithak-balah,
pravadanti na panditah
Ekampyasthitah samyak,
ubhayor-vindate phalang.

Meaning: *Sankhya* and *Yoga* are not considered to be different by those who are enlightened. A person who has perfected himself in the application of even one of these two, achieves the results of both. Also,

Yat-sankhyai prapyate sthanang,
tat-yogair-api gamyate
Ekang sankhyang-cha yogang-cha,
yah pashyati sah pashyati.

Meaning: The state attained through the renunciation of actions as prescribed in *Sankhya*, can also be reached through the performance of prescribed actions as prescribed in *Yoga*. Those who have effectively assimilated this fact and realize *Sankhya* and *Yoga* to be one and same, are able to behold reality as it actually is.

...to be continued

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

Unmesh

[Soul's Blooming - Part V]

Sree Sree Maa Sharbani

Raas Purnima (2008)

Sree Sree Maa's response to a Disciple's Query during a Spiritual Discussion Session...

Question: When does tattwa-gyan (knowledge of fundamental principles of spiritual science) bloom within a sadhaka (spiritual aspirant)?

Sree Sree Maa: Sthir-Buddhi (steady intelligence) and Bodhi (innate realization emerging from one's eternal existential self) assimilate in the heart. From the harmony of this assimilation, knowledge of fundamental principles blossoms within a sadhaka yogi. A yogi, who is able to correctly harmonize the innate meaning of experienced realizations from such self-intellect illuminated understanding, earns the right to be called a Vedagya or Brahmagya – or one who is knowledgeable about and can explain the Vedas or Brahman and its principles. Yogi sadhakas cannot attain this stage unless the vibrations of prana (life force) stabilize in their heart centre. Implicitly derived knowledge is not sufficient to enable blooming of pristine Truth in a yogi. Explicit and steadfast realization in the heart is the essential aid for unveiling the real face of Truth. Only such Yogis who have reached capabilities of being able to explain the science of spirituality based on directly self-experienced and harmonized knowledge is called a 'Shastravid' or Adept of the Scriptures.

Question: How can Buddhi and Bodhi be harmonized in the heart?

Sree Sree Maa: This can materialize when the heart lotus awakens and opens up through the continuous practice of Prana Sadhana or Brahmavidya Sadhana, like in Kriya-Yoga, under the guidance of a spiritual master or Sadguru. As this sadhana steadily matures and deepens, the movement of the prana (life-force) attains a calm stillness in the heart, thereby enabling the yogi's existential consciousness to reside in union with the soul within (atmastha state). In this state, a yogi's buddhi-shakti (intellectual power) becomes unwaveringly steady and through the help of this intellect-illuminated-soul-harmonized knowledge, a yogi is able to rise to the level of 'Bodhi' or 'Sambodhi' – experientially realized knowledge of the fundamental principles of universal creation.

While it is true that the harmonization of Buddhi and Bodhi blossoms within a yogi sadhaka through the constant practice of atma-karma (sadhana of the soul like in Kriya Yoga), to achieve this stage, the Grace of the Divine Master (Guru Kripa) is required. This is because the two essential forces needed for this steadiness in a sadhaka's heart are Sadguru-Shakti (Spiritual Power of the Sadguru) and Kripa (Power of Divine Grace). Without Sadguru's Kripa, it is impossible to achieve this. In spite of strong sadhana samskara (accumulated karma) of past lives, a sadhaka cannot progress a single step in spiritual life without a Sadguru's guidance and grace. Therefore, while practicing Yoga-vidya, through Guru-Kripa, a sadhaka's chitta (inner being of heart-mind) becomes fully absorbed in the soul and through this unification, fundamentals of spiritual science automatically begin to spurt. With the emergence of fundamental principles, a yogi progressively attains a state of Pragyan (Steadfast in Knowledge). Pragyan provides clarity of insight, removing scope for

inconsistency or conflict between various experientially felt understandings. The Knower and Knowledge mingle to become one entity. Now whatever a yogi knows, he or she does so by becoming. The bliss of this unification is Brahmananda (Joy of being One with Brahman), which is identical to the Atama-Rama state (Unification of the Soul with the Supreme Soul). This is the essential inherent nature of Pragyan. Attaining such a stage is considered God's Prasad (divinely sanctified gift). Henceforth, in every situation or state, a Yogi remains in constant connect with the Supreme Divine.

Question: On such harmonization of Buddhi and Bodhi, what visualized experiences appear (darshan-anubhuti) in the Kutastha of a Yogi sadhaka?

Sree Sree Maa: On such harmonization of Buddhi and Bodhi, vibrations of samvit (pure consciousness of existence) are visualized within the cave of the Kutastha's night-like sky of one's heart's consciousness like pulsating flickers of fire. Thereafter progressively, in such a state of absorbed union with the kutastha-sky, several other visualizations including Anahata Nada (unstruck notes of Omkar) are seen and heard. On transcending the source of these flickers of fire in the sky of the heart through deep meditation one can reach Lord Vishnu's Param Pada (Transcendental Feet, Doorway of the Divine) and be able to gaze at it constantly.

Advanced Kriya sadhakas, on reaching the state of Paravastha (stillness of the state beyond normal breath), through nyasa-kriya of Siddha Vasudeva Mantra and supporting grace of the Sadguru, are able to enter into the sky of consciousness of the heart lotus. These experiential visualizations manifest within the Kutastha of yogis who attain this state.

...to be continued

—Translated into English by Her Blessed Child **Dr Durgesh Chakrabarty**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(9)

The initiation by Guru 2:

It is needless to say about the extraordinary art of initiation by the great masters and often they leave behind some divine marks on their disciples. Moments after initiation by touching his vertex, Manicklal felt that the vertex area of his head underwent a sudden swelling upwards. He recognized this when he went back to Bhutnathbabu's residence and we saw that it remained as it is, elevated and swollen, till the last day of his life. He used to make us feel with our hand frequently. We have also seen Manicklal getting intense pain on that elevated area sometimes and then he used to instruct his youngest son, Nanda to hit hard on the area with the hope of immediate relief from pain. He used to call his worshipful Gurudev as Babaji Maharaj or Kailashpati. When Manicklal was repeatedly asked about the identity of his Guru, Manicklal used to say sometimes that the little bit that he understood about him was, "Babaji Maharaj is the immortal personality of the four yugas. He is the knower of the three times, the mighty conqueror of death, Lord Parasuram himself." But he also used to say that the arrogance of asking his name has never arose in the mental plane of Manicklal.

Few excerpts from his self-written notes regarding initiation are - "When I returned

back to my house, I found the part of my head that had the divine touch of my Gurudev has undergone proliferation and become elevated. The essence of spirituality was slowly cleared to me and I started becoming more introvert. Publicity,

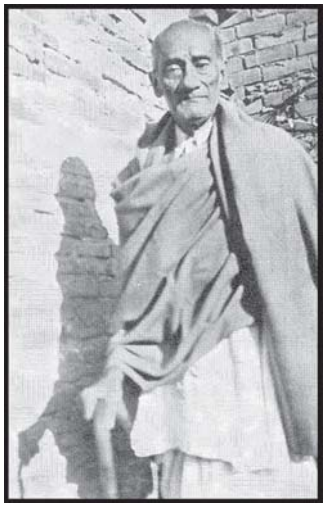

irrespective of place, time, object or the allurement of woman, money or fame no more attracted my mind. Putting my mind at the lotus feet of Sri Guru, I tried to remain ever alert so that the killing senses cannot allure my mind. Slowly the needy and the dispatched persons unexpectedly came and became connected with me. Where in the world they were, in the lap of the Mother and how they came to me are all matters of wonder. It seems that Sri Guru's grace to me was in concordance with the prophecy which Sri Sri Shyamacharan Lahiri mahasay made that after forty years, a unique mission of service to mankind will diffuse globally. The great Gurudev who became the cause and subject of the cosmic mission said, 'Amen' to the mournful prayer of the performing disciple."

From the memorable 1911, continuously for long fifty years, Manicklal, with the grace of his Guru coordinated the essence of the philosophy of Eastern rishis with the prevailing Western scriptures. How the great sages from Great Britain, France, Germany, Russia, America, etc. met and got connected with Manicklal most astonishingly has been dealt with partially in the following chapters in sequence.

The green expanse of Kanu junction (Thana junction presently) under Eastern Railway and the nearby banyan tree is present even today. The banyan tree, the witness of a divine event, presently shelters an oil godown of Railways. We have visited the holy place during the lifetime of Manicklal.

We are aware of more meetings of Manicklal with Babaji Maharaj following the initiation. This happened in his sadhana room in the first floor of his house at Chinsurah Kamarpara. Once when Manicklal had the real vision of the secret yogic association of Sri Sri Gauranga Mahaprabhu with his Guru Keshab Bharati, as a part of the divine leelas of Mahaprabhu, and he was praying to his Guru for the confirmation of the same, Kailashpati Babaji Maharaj arrived at his holy room with Premavatar Sri Sri Mahaprabhu. Astonished, horripilated with delight and hypnotised Manicklal provided two asanas for the two towering mahapurushas.

The mahapurushas took their seat, solved all questions that arose in Manicklal's mind lovingly and then disappeared. The asanas in which they sat, are still present in Manicklal's house, which he frequently used to show us with overwhelming delight. On the same night, Sri Sri Gaurangadeb visited Sri Bankim Chandra Majumdar mahashay of Dharampur, Chinsurah, near a cemetery, and Sri Satyendralal Sarkar mahashay's house at Shandeswartala, Chinsurah and gave his auspicious darshan to them. Bankim Chandra Majumdar, an ardent lover of God, and his wife, were immersed in dhyana in their meditation room when he realised the kind appearance of Karunavatar and divine love personified Mahaprabhu. Later on honourable Bankimbabu and Satyenbabu narrated the

unprecedented luck of Mahaprabhu's darshan to Manicklal merrily. Manicklal also narrated to them happily the holy talks of Mahaprabhu, that he heard on that night and that which he jotted down before hand and they became overwhelmed with an inexpressible heavenly joy. Sri Sarkar mahashay is still alive and associated with us. *...to be continued*

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay
Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(61)

Several yogis of higher order, sadhaks and writers used to visit the ashram house of our respected Guru Maharaj (Sri Sri Saroj Baba). One such sadhak-writer Sri Nigurananda used to come to our Guru Maharaj for his holy company. He had narrated a peculiar story to his disciples about our Guru Maharaj. Following is the narration that he had written in his two books - 'Jibatma Rahasya' and 'Paraloke of Jatishwar.'

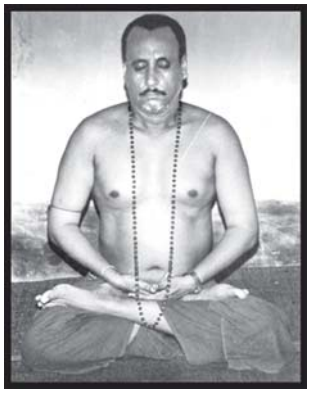

The astral body of humans can wander in some other place during their lifetime. The yogis can visualise their astral body during meditation. They first see their second body from behind. Slowly the image turns towards the yogi and finally they face each other. This is the darshan of the second or astral body of the yogi. This is the result of kundalini awakening.

The yogis visualise these according to the principles of physics due to rise of energy level from kundalini awakening. The yogis also claim that the higher energy levels enable them to go to different planets. It appears that the smaller wave of the energy levels is responsible for the farsightedness like the electric media in this earth, which can catch signals from other planets. The yogis claim that the inhabitants of those planets can see their astral bodies as they react when they see the bodies. But I have seen a yogi who could appear before us in his astral body. He had appeared in front of my publisher friend Sri Dulalendu Chattopadhyay. He is Sri Saroj Kumar Lahiri, Lahiri Baba of Baksara, Howrah. Dulalbabu said that he spoke about his miraculous power. He appeared whenever he was thought about. I developed a great eagerness to see such a yogi. I visited him with a letter from his disciple. Then I went to him several times. Thereafter we had intimate relationship. I once told him, "You have been appearing in your astral body in front of many, why don't you appear before me once."

He said – I can't appear before everybody.

- Why?

- That I can't explain to you.

I said, it is my bad luck that I could not become a witness to a miraculous event.

He said, I cannot appear before you in my astral body but can give you the proof that it is possible to go elsewhere with the subtle body.

- How?

- You sit in meditation – isn't it?

- Yes, little bit
- When do you sit for dhyana?
- Around 9pm
- Today I will go at that time.
- To my place at Tollygunge from Baksara at 9pm?
- Yes

That night I couldn't sit in meditation at 9pm. Probably I sat at 11pm, but he did not come. I met him after about 2 months. I said, 'You didn't come that day?'

- Yes, I went!
- You came?
- Yes, you did not sit for dhyana at 9pm. Isn't it?
- Yes
- Didn't you feel anything?

Then I remembered that – yes, someone with two hands at my armpit was trying to drag me up. I said it to him.

He said, then?

- Why didn't you appear before me?
- I already said that I can't appear before anybody and everybody.

I did not enter into any argument with him regarding this. But I had the conviction that the yogis can move about in their subtle body.

(62)

Now I tell something about my personal life (Sri Pradip Chattopadhyaya, Shibpur, Howrah)

I had some obstacles to my marriage in the horoscope. My mother started to contact people for my marriage. I had to go to several places to see the bride like Deulti, Uluberia, Uttarpara, Behala, Krishnanagar, Shibpur, Baksara, Santraganchi etc. In the meantime, one Sunday morning I was sitting near Guru Maharaj. Suddenly Gurudev said, "Pradip, why do you go to see the bride in different places by giving trouble to your mother? It will be done within a week and your marriage will be in the next locality." Surprisingly, my school friend came after 3-4 days with the bride's elder brother. I used to recognise the younger brother of the bride because he was a student of our school. Anyway, our marriage went well by the grace of the Mahaguru. Sri Sri Baba was a rishi, who could see the three times. This class of rishis have the power to utter infallible words and can visualise the past and future.

(63)

One evening I was sitting alone near Gurudev. A thought was pondering in my mind for a few days – whether I can proceed in the path of spirituality after getting such a great sadguru. I already got initiated in kriyayoga by then. I was immersed in this thought while sitting near Gurudev. Suddenly Gurudev called me near him and said, "See my son, Pradip, even if you cannot be a steamer in this life, you can be a strong boat." I felt very happy. I thought it is not easy to become a boat even! Lord Sri Krishna carried the great sadhikas, the confidante of Krishna, in the boat as a helmsman to the other side of the river.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Let me tell you how to love all equally. Do not demand anything of those you love. If you make demands, some will give you more and some less. In that case you will love more those who give you more and less those who give you less. Thus your love will not be the same for all. You will not be able to love all impartially.

—Sree Sree Maa Sarada

Mata Sharbani Trust
Annual Report (2017-2018)

The vision of Mata Sharbani Trust is based on the ideals of its principal and patron, Sree Sree Maa Sharbani who, in the spirit of highest universal values, has charted a path that combines realization of supreme truth with service to humanity. The goals of the Trust cover humanitarian, spiritual and cultural aspects in an attempt to serve people, irrespective of gender, caste, creed, religion or race and spread the message of unity and eternal Truth. Preserving our prized heritage and reviving them in the modern age, providing relief to the needy and poor, assisting people with educational and medical support, helping destitute homes and educational institutions, etc., form some of the core activities of the Trust. Spreading the message of unity of spiritual paths, practice of Brahmavidya as a means to attain self-realization, publication of books / CDs/ cassettes on Indological themes, study of Sanskrit and practice of music through regular sessions, teaching of yoga as a means for good health, dissemination of knowledge through maintenance of a library of rare books, holding of cultural events on Indological themes, regular spiritual discourses on auspicious occasions, detailed studies on our scriptures to appreciate its true meaning for self-realization and service, satsang with saints and sadhus, distribution of relief materials including clothes, blankets, food and medicine to the poor, educational support for the needy, providing drinking water facilities and other infrastructural support for development of adjoining rural areas, rendering support to similar organizations working especially for the well-being of forsaken women and orphaned children, are some of the regular activities of our Trust. The Trust carries out its activities through its main centre at Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing Shibrampur and auxiliary centres in Varanasi, Puri, Nabadwip and its associated organization, Sarada-Ramakrishna (Shishu O Mahila) Sevashram, an orphanage cum residential school in the village of Marjada (Hotar), located on the outskirts of the city of Kolkata. The main centre at Akhanda Mahapeeth also has a Self-Realization Centre-cum-Cultural Complex inside the main Trust premises and the Bhakta Nivas and Annapurna Kshetra inside Plaza Housing locality of Shibrampur. We highlight below some of the important activities that were carried out during the period April 2017 to March 2018.

Several charitable activities were carried out from the main Ashram premises of the Trust at Akhanda Mahapeeth, Shibrampur. Like every year, more than 1000 poor people were donated new clothes and food packets during two sessions, one prior to Durga Puja and one before Kali Puja. These included sarees for women and dhotis / lungis for men and dresses for children. Later in December, more than 300 woolen blankets were donated to the needy people of the region. Education aid and Medical aid was given to several people during the year. During the Navratri festival, 'bhandara' was organized on several days and food was distributed for people of the locality. During the Annapurna festival, children of the locality were especially provided food, served by Sree Sree Maa herself. During the anniversary of enthronement of the Guru Maharajas, 'bhandara' was held and a special food arrangement was made for the children of the vicinity. Several ongoing social services in the locality were continued. In addition, regular road refurbishing has been carried out to enable people of the region to have better access from the main road to their homes. Infrastructure was improved in the main Ashram premises during this period. The marble fixing work of the outer walls have progressed significantly. Bhakta Niwas was repaired. Several charitable and spiritual activities are carried out from the premises of Bhakta Niwas / Annapurna Kshetra.

The following activities were carried out for the Hotar Sevashram – Classes were smoothly continued for the Sarada Shiksha Mandir, the Pre-primary and Primary school run by the Sevashram. For this, all infrastructure setup including renovation of rooms, school rooms and Sevashram building outside walls were implemented. Copy books, pens and pencils were provided for the school children and facilitated through the Trust. In addition, regular ration supplies of nutritious food, clothes, regular usage items and educational material, including books, were provided for the resident children. Several devotees of the Trust have regularly visited the Sevashram on a weekly basis to provide services, especially to teach the children studying in the Sevashram School to help improve their academic performance. The special drive

to 'Support a Child' for food and education purposes initiated in the previous year was continued and it received a positive response.

Renovation works were continued out in the Nabadwip Ashram of the Trust.. Regular maintenance of the Ashram was carried out and maintained even after the passing away of Shri Dayananda Giri Maharaj. Sree Sree Maa and other devotees visited the Varanasi Ashram and carried out charitable activities like sadhu seva. Minor repairs were carried out in Puri Ashram. The Varanasi Ashram was well looked after by Sri Gurudas Ashram Maharaj, who stays there for extended periods during the year.

Many other activities that form part of the core objectives of the trust were carried out with full fervor. Several publications were made from the Trust during the year. These include Hindi book 'Usha ke Aalok', which is a translation of the Bengali book Ushar Aalok by Sree Sree Maa. Four issues of the quarterly journal Hiranyagarbha were published. Yoga classes and teaching of Sanskrit texts were held regularly. The invaluable spiritual library, containing more than 2000 books, was functional throughout the year. Several new books have been added to the library in the last year. The bi-weekly discourse on the Bhagwat Gita by Dr Barun Dutta was continued every alternate Sunday morning. More than seventy sessions are already completed. The other extremely valuable feature is the monthly class on Patanjali Yogasutras conducted by Sree Sree Maa herself, especially for women sadhikas. Sree Sree Maa continued with her Saturday evening music classes on a regular basis. Several new songs were composed by her and some devotees during this period. The Ashram holds four Spiritual Discourses every year on topics of interest. Four sessions were delivered by Dr Barun Dutta, focusing on the Upanishads in general and Katho Upanishad in particular. These will be continued to cover the major Upanishads. A special new set of lectures on spirituality with special emphasis on Kriya Yoga was initiated and delivered by Sree Sree Maa herself where she not only spoke on key principles and methods but also answered questions from various people on the topic. Five Brahmacharini women of Akhanda Mahapeeth and Hotor Sevashram were ordained into monkhood to devote the rest of their lives in spiritual practice and service to humanity.

A number of events were held highlighting Indian culture. These included regular programmes by devotees during various special occasions. Several eminent people performed in the Ashram premises to highlight various aspects of Indian culture. These included sangeet recitals by well-known actor and performer Shri Arindam Ganguly, Smt Laboni Lahiri, and Shri Subrata Sengupta, dance programmes by the members and pupils of Guru Giridhari Nayak of Odishi Ashram, and several music and dance programmes by Hotor Sevashram children and Akhanda Mahapeeth Ashram devotees, etc. Sree Sree Maa scripted some unique storyline-based songs interspersed with small pieces of speech that highlighted deep spiritual thoughts accompanied by blissful music during many of these events. Several meetings with saints and savants were held during this period. Mahatma Sri Sri Taat Baba of Pushkar visited our Ashram. Dandiswami Sri Nityabodh Ashram Maharaj of Chinsura, Swami Shuddhananda Giri, Head of Yogoda Satsanga Mission, Kolkata, Shri Imtiaz Ali Jonab, also visited the Ashram. Sree Sree Maa visited Prem Kutir Ashram in Rishra. She also visited the Varanasi Ashram, Udaipur and other places for charitable purposes and spreading the message of unity. Other members visited Puri and Varanasi, especially Swami Shri Gurudas Ashram frequently visited Varanasi Ashram to maintain the activities there.

Dr Durgesh Chakrabarti has been included as a New Trustee of the Trust during this period. Shri Raj Kumar Daga, Chartered Accountant, has been retained as Auditor. The Trust accounts for financial year were audited by Shri Raj Kumar Daga and duly approved by the Trustees.

With the grace and guidance of the Supreme Divine, Sree Sree Maa, all patrons and well-wishers, we hope to continue serving mankind with dedication and devotion. We express our sincere thanks and gratitude to all donors, devotees and volunteers for their help, dedication and selfless efforts in helping our mission to succeed. We feel blessed to have received this unique opportunity to serve. We pray for the well-being of all.

-Shri Siddhartha Nandi & Swami Sadasivananda,
Trustees and Joint Secretaries, Mata Sharbani Trust
Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing (Jagannathpur) Shibrampur,
24 Parganas (S), West Bengal 700141, India. *November 25, 2018*

News in Brief

14th January: The 10th anniversary of the enthronement ceremony of the Guru Maharajas was conducted with full majesty. At dawn on this day, puja of the Guru Maharajas was conducted, followed by yajna and offering of prasad among all devotees present. In the evening, a cultural session was organized where an enchanting odishi dance program was conducted by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak after a collection of melodious bhajans presented by the guru brothers and sisters. The previous issue of Hiranyagarbha was also released on this day.

3rd February: Sree Sree Maa along with a few Ashramites visited 'Hotor Ashram' on

their annual programme. Shadhvi Suchetanandamoyee and Shadhvi Punyanandamoyee welcomed Sree Sree Maa through arati and garlanding. The students and brahmacharinis of the Ashram also paid their homage to Sree Sree Maa. The children of the Ashram performed a beautiful cultural programme.

9th February: On this evening Sri Subrata Sengupta presented Rabindra Sangeet in presence of Sree Sree Maa at Akhanda Mahapeeth. His melodious voice enchanted the devotees present.

2nd March: Sree Sree Maa along with a few Ashramites visited 'Yogoda Satsang Society'.

4th March: On the auspicious occasion of 'Shivaratri', puja of Lord Param-Shiva was performed.

21st March: Prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the Ashram premises and 'dol-purnima' was celebrated through a cultural evening where a beautiful dance recital was presented by Samadrita Basu (child artist) and thereafter on 'Vasant Utsav' Odissi dance was performed by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak.

24th March: The 30th 'Adhyatmik Sabha' was organized. Our brother disciple Dr.

Barun Dutta continued the discourse on 'Kathopanishad'.

13th April: On the auspicious occasion of Asthami tithi of the Navaratri festival, puja of Mata Annapurna was held at the Annapurna temple. Prasad was distributed among the children and devotees.

14th April: In the evening, a mesmerizing program of bhajans was held in the Ashram marking the occasion of Ram Navami.

Forthcoming Events

Buddha Purnima: 18th May, Saturday
Spiritual Congregation: 30th June, Sunday
Guru Purnima: 16th July, Tuesday

Statement about ownership and other particulars about HIRANYAGARBHA to be published in the first issue every year after the last day of february.

1. Place of publication : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

2. Periodicity of Publication : Quarterly

3. Printer's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

4. Publisher's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

5. Editor's Name : Sri Arnab Sarkar
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.
: Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

I, Dr. Barun Dutta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledege and belief.

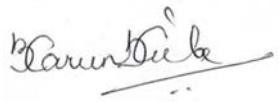

Date: 15th April, 2019 Signature of the Publisher